লোলার্ক মেলা।

প্রতি ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠীতিথিতে বারাণসীতে এই মেলা হইয়া থাকে। অসিঘাটের নিকটে একটী বৃহৎ কূপ আছে এই কু কে লোলার্ক কুণ্ড কহে। কাশীখণ্ডে কথিত আছে যে যৎকালে রুদ্রদেব কোপান্বিত হইয়া সূর্য্যকে বধ করেন, সেই সময়ে তাঁহারই দেহের একখণ্ড আসিয়া এই স্থানে পতিত হয় ও সেই সময় হইতেই এই লোলার্ক কুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা উত্তর পশ্চিম বাসিগণের একটি প্রধান পর্ব্বাহ। তবে কাশীবাসী বাঙ্গালীরাও সেই কুণ্ডে স্নান ও পূজা করেন। এই উপলক্ষে একটি মেলা বসে। সেই মেলা উপভোগ করাই লোকদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। লোকে এই মেলা দেখিবার জন্য বহুদূর দূরান্তর হইতে আসিয়া থাকে। এই উপলক্ষে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের অয়োজন হইয়া থাকে। বালক, বালিকা, যুবা, প্রৌঢ় সকলেই সমভাবে ইহাতে যোগদান করে। ম্যাজিক, বায়স্কোপ, সুলভ ও অল্প মূল্যে অথচ কৌতুকজনক নাগরদোলা, "মেরিগোরা উণ্ড" ইত্যাদি কৌতুকজনক খেলায় তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে। তখন রাজপথের দুই পার্শ্বে অগণ্য দোকান লোকে পরিপূর্ণ থাকে। এই মেলায় সকল জিনিষ অপেক্ষা একটি জিনিষের বেশী বিক্রী দেখিলাম। সেটি "পেঁয়াজের ফুলুরী" গরম গরম ফুলুরী ভাজিয়া বিস্তর স্ত্রী পুরুষে বিক্রয় করিতেছে।

ময়রাগণ নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তত করিয়া লোকদিগের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত দোকানগুলি উত্তমরূপে সাজাইয়া আগ্রহের সহিত খরিদ্দারের অপেক্ষা করিতেছে। এই মেলার সময় পথে অত্যন্ত অধিক জনতা হয়। গাড়ী ঘোড়া যাইবার স্থান থাকে না। অনেক সময়ে শুনা গিয়াছে যে এই জনতায় বহু অলঙ্কার যুক্তা স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার অপহরণ করিবার জন্য দুষ্ট লোকরা সেই স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা বা নাক কান কাটিয়া তাহাদের অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রী সমভাবে পথে যাতায়াত করিতে থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অভিভাবকের সহিত গমন করেন কেহ কেহ বা একলাই যান। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের জনতা অধিক থাকে, পরে বৈকালে পুরুষদের জনতা। সকালে কেবল মহিলারা সেই কূপে স্নান পূজার্থ গমনাগমন ও কেনা বেচা ইত্যাদি করেন। কিন্তু পুরুষদের জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়া নানাবিধ গীত বাদ্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

সন্ধ্যার পর মেলার ঘটা আরও বাড়িয়া উঠে। চারি দিকে অস্তগামী সূর্য্যের নিস্তেজ

কিরণমালা বিস্তারিত হইয়া পড়ে, পরে ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসে। তখন জনতাও কিছু কম হয়। এবং ফুলের সুন্দর গন্ধে অন্তর প্রফুল্লিত হয়। মালাকারগণ মালা গাঁথিয়া চতুর্দ্দিক সৌরভেপূর্ণ করিয়া বিক্রয়ার্থ ইতস্তত গমন করে। অন্ধকার হইলে দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হয়। তখনকার সে দৃশ্য অতি সুশোভন ও মনোহর।

এই প্রকারে রাত্রি অধিক হইলে মেলা ভঙ্গ হইতে থাকে। সকলে সারা দিন নানারূপ আমোদ প্রমোদ করিয়া ক্লান্ত শরীরে আগামী বর্ষের মেলার প্রতীক্ষা করিয়া সেখানে হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

এই লোলার্ক কুণ্ডের পথে "কেনারাম বাবার" আস্তানা নামক একটি অনতিবৃহৎ মঠের ন্যায় মন্দির আছে। সেখানকার বাৎসরিক উৎসব এই দিনেই হইয়া থাকে। সন্ধ্যার পর হইতেই দলে দলে লোকে সেখানে গিয়া সাধু কেনারামের সমাধি দর্শন ও পূজা করে। পূজোপকরণের মধ্যে সেখানে গাঁজাও দিতে হয়। উক্ত সাধু সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী আছে যে এই কাশীতেই তিনি একটি মৃত বালককে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ইনি সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে গণ্য। বারাণসীর নর্ত্তকীরা ইহাঁর বড় ভক্ত। সকলেই আসিয়া এই উৎসবে প্রণামী দিয়া সমস্ত রাত্রি স্বতঃই নৃত্যগীতে সেই সমাধি প্রাঙ্গন মুখরিত করিয়া থাকে।

লোকে বলে কাশীর "বুড়োমঙ্গল" আর লোলার্ক মেলা এই দুটি প্রধান মেলা।

কুমারী সুনীতি
কেশবধাম বেনারস।

হারকিউলিস্।

মহাবীর হারকিউলিস (Hercules) এর মহিষী (Deianira) ডিয়ানিরা পরিপার্শ্বস্থা পরিচারিণীগণের নিকটে আপনার দুঃখ কাহিনী বিবৃত করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন, তিনি ইটোলিয়া (Ætolia)র রাজকুমারী ছিলেন। যৌবনে জলদেবতা একিলস (Achelous) তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার পরে বিশ্ববিজয়ী হারকিউলিস্ যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন।

বীরপত্নী ডিয়ানিরা পতিগৃহে আসিলেন এবং ক্রমে বহু সন্তানের জননী হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। দেবরোষে তাঁহার স্বামী দেশান্তরিত হইয়াছিলেন। হিরা (Hera) দেবীর অভিশাপে বীরবরের জীবনের অর্দ্ধেক কাল প্রবাসে কঠোর শ্রম ও ক্লেশকর পর্য্যটনে কাটিতেছিল। গৃহের শীতল শান্তি সম্ভোগ করা দুদিনের জন্যও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না। স্বামী সঙ্গ বঞ্চিতা সাধ্বী রাণীর অশ্রু জলের তাই বিরাম ছিল না।

সম্প্রতি (Zeus) জিয়স দেব আবার তাঁহার প্রতি কোপ-কটাক্ষপাত করিলেন। তাঁহার আদেশ, Herculesকে দ্বাদশ মাস লিডিয়া (Lydia) রাজ্ঞীর অধীনে দাসত্ব করিতে হইবে। বীরের এরূপ অপমান! কিন্তু উপায় নাই। দেবাদেশ অগ্রাহ্য করিবার নয়। একেলিয়া (Achalia)র রাজপুত্র। ফিটস (Phitus) এর তিনি প্রাণবধ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধের শাস্তি এই।

পত্নী ও পুত্রগণের ভার আত্মীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি যাত্রা করিলেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন তাহা তাঁহারা জানিলেন না। হারকিউলিস (Hercules) মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন, যাহার জন্য তাঁহার এই লাঞ্ছনা ভোগ, নিয়তির কাল পূর্ণ হইলে তিনি তাহাকে ইহার প্রতিফল দান করিতে ভুলিবেন না।

তাহার পর ১৫ মাস কাটিয়া গিয়াছে হারকিউলিস (Hercules) আজও ফিরেন নাই, সতী সাধ্বীর চক্ষের জলও এক দিনের জন্য শুষ্ক হয় নাই। স্বামীর সংবাদটি পর্য্যন্ত তিনি জানেন না। আপন দেশ, আপন রাজ্য ছাড়িয়া বিদেশে অপরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের ন্যায় মহারাজ কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! তাঁহার চির পুরাতন এই দুঃখ কাহিনীই রাণী-পরিচারিকাদের নিকটে বলিতেছিলেন।

বৃদ্ধা এক ধাত্রী বলিল—"বৃথা বিলাপে আপনার জীবন আর ক্ষয় করিয়া কি ফল, বৎসে? উঠ, অশ্রুজল মুছিয়া ফেল। বীরপুত্রগণের জননী তুমি—তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে পিতার উদ্দেশে প্রেরণ কর। সে তাঁহার সন্ধান লইয়া ফিরিবে। ঐ দেখ তোমার হিলস্ (Hyllus) এইখানেই আসিতেছে।"

দীর্ঘাকৃতি প্রিয়দর্শন এক যুবক গৃহে প্রবেশ করিল। স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্নেহসিক্ত করিয়া জননী জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে বলিলেন—"তোমারই কথা হইতেছিল। তোমাদের পিতা—"বাধা দিয়া Hyllus বলিলেন—"সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি, মা। জনরবের কথা যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে আমাদের পিতা———

—"কোথায় কোথায়? কেমন আছেন তিনি? কোথায় আছেন?"

Hyllus বলিলেন—"ইউবিয়াতে তাঁহার পুরাতন শত্রু ইউরিটাসের (Eurittus) বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগে এখন তিনি ব্যাপৃত।" উত্তেজিত ও বিস্মিত হইয়া দেয়নিরা বলিয়া উঠিলেন—"ইউবিয়া!—তাহার সকল পরীক্ষা ও সংগ্রামের অবসান এই স্থানে হইবে বলিয়া তো দৈববাণী হইয়াছে! এই সংগ্রামে যদি তিনি জয়ী হন তাহা হইলে অবশিষ্ট সমস্ত জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারিবেন। আর যদি তাহা না হয় —কিন্তু যাও, বৎস, শীঘ্র তোমার পিতার সাহায্যে যাও। এই সঙ্কটসময়ে তাঁহার তোমার সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন।"

"যাই মা" বলিয়া পুত্র বিদায় লইলেন। চঞ্চলচিত্তের ব্যাকুল উত্তেজনাকে শান্ত

করিবার আশায় রাণী একটি বালিকাকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন—"কাজ এখন থাক্, বৎসে,—সেই গানটী আমাকে শোনাও—সেই (*Harcules*) হার্কিউ-লিসের বীরত্বকাহিনীর গৌরবগাথা।"

বালিকা বীণার সঙ্গে গান ধরিল। কোমল কণ্ঠের মধুর ধ্বনি সকলকে মোহিত করিয়া ধীরে ধীরে আকাশে মিলাইয়া গেল। বিগলিত-চিত্ত রমণী-মাতা স্নেহের দৃষ্টিতে বালিকার দিকে চাহিয়া কাহলেন—"মা! আমার সকল ভাবনা, সকলপ্রকার চিন্তা তোমার ঐ গান শুনিলেই ভুলিয়া যাই। তুমি, মা! ভাবনাচিন্তার কথা কি বুঝিবে? ভয়-ভাবনাবিহীন তোমার ঐ শুভ্র কুমারী জীবন পুষ্পের মত চারিদিকে মাধুর্য্য ও সৌরভ ছড়াইতেছে, রৌদ্রতাপ ও ঝঞ্ঝাবাত হইতেও সুকুমার জীবনখানি এখন সম্পূর্ণ আবৃত। কিন্তু হায়! মা! চিরদিন এমন থাকিবে না। বাল্যের মোহন স্বপ্ন একদিন ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন জাগিয়া উঠিয়া দেখিতে পাইবে কি দুঃখকষ্টের বিষম বোঝা বহিবার জন্য এ সংসারে নারীজন্ম লাভ হয়!"

আত্মবিস্মৃতা রাণীর সকল কথা বুঝিবার মত ক্ষমতা বালিকার ছিল না, সে ছল ছল নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাণী তখন সকলকে লক্ষ্য করিয়া উদ্বেলিত নেত্রে বলিতে লাগিলেন—"আশা ও আশঙ্কার মধ্যে আমার হৃদয় কাঁদিয়া মরিতেছে। যাত্রাকালে হার্কিউলিস্ বলিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনব্যাপী সংগ্রামের এই শেষ। যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার সম্পত্তি পুত্রগণ ও আমার মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—'হইতে পারে আমার জীবনের এই শেষ, প্রাণ লইয়া আর না ফিরিতেও পারি। এক বৎসর তিনমাস গত হইলে তবে আমার ভাগ্যলিপি পরিবর্ত্তন হইবে। সেই সময় আজ আসিয়াছে—আমার ভাগ্যে কি আছে কে জানে।'"

এই সময়ে বিজয়চিহ্নধারী অনুচর আসিয়া মহারাজের মঙ্গলসংবাদ দান করিল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাহার নিকটে এই সংবাদ পাইলে?" সে বলিল,—"Hercules এর দূত চির-বিশ্বাসী লাইকাসের (Lichas) নিজের মুখ হইতে। জয়লব্ধধনরাশী বহন করিয়া অচিরে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন। নগরবাসীগণ সহস্র প্রশ্নে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সেই সুযোগে, সর্ব্বাগ্রে শুভসংবাদ দানের পুরস্কার লাভ করিবার আশায় জনতা ঠেলিয়া আমি মহারাণীর চরণে উপস্থিত হইয়াছি।"

"সাজাও—সাজাও—ওগো, আর কোনও সংশয় নাই! লাইকাস এর (Lichas) নামোল্লেখমাত্র মন হইতে সকল সন্দেহ নির্ব্বাসিত হইয়াছে। মহোৎসবের আনন্দউৎস বহিয়া যাক্। আজ আলোকমালায় সমস্ত রাজভবন হাসিয়া উঠুক।"

অনতিবিলম্বে লাইকাস্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে বিজিত

রাজ্যের বন্দিনী কুমারীদল। দূতকে সম্মানসূচক অভ্যর্থনা করিয়া রাণী স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। লাইকাস বলিলেন—"আমি তাঁহাকে ফিরিবার সময় পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল দেহ দেখিয়া আসিয়াছি। এখন তিনি দেবতা ঝিয়স (Zeus) এর মন্দির নির্ম্মাণে ব্যাপৃত। যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে জয়লাভ হইলে দেবতার অধিষ্ঠানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।"

তখন একটি একটি করিয়া রাণী দীর্ঘ-বিচ্ছেদকালের ঘটনাগুলি শুনিতে লাগিলেন। নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে রাজা কোথায় ছিলেন, নির্ব্বাসনের কারণ কি দূত সকল কথা বলিতে লাগিল।—নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে হার্কিউলেস ইউবিয়ারাজ ইউরিটাসের গৃহে অতিথি ছিলেন। সেই সময় ইউরিটাস্ একদিন তাঁহাকে অত্যন্ত অপমান করেন। অপমানের আক্রোশে উন্মত্ত হইয়া হার্কিউলিস গৃহস্বামীর পুত্র ইফাইটাস (Iphitus) এর প্রাণবধ করিয়াছিলেন। লিডিয়ামহিষীর গৃহে বৎসরব্যাপী দাসত্ব করিয়া তাঁহাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া তিনি ইউবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাহার পরিণাম ইউরিটাসের সম্পূর্ণ পরাজয়।

এই সকল কথা শুনিয়া রাণী মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া কি চিন্তা করিলেন। কোন অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়কে অত্যন্ত আকুল করিয়া তুলিল। রাণীর মুখে চিন্তা ও বিষাদের ছায়া দেখিয়া পরিচারিকা কহিল—"কোন্ অজ্ঞাত বিষাদের কৃষ্ণ ছায়া এই আনন্দের শুভ সময়ে রাণীর হৃদয়কে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল?"

রাণী কহিলেন—"না-না-না—আমার আনন্দ হইতেছে—বিষাদ নয় অশুভ আশঙ্কা নয়—আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে! তথাপি আনন্দের আতিশয্য ভাল নয়, কারণ অসংযত আনন্দের অবসান অশ্রুজল। আর এই বন্দিনী বালিকাদিগকে দেখিয়া আমার অন্তরে করুণভাবের সঞ্চার হইতেছে। কোন্ উদ্যানে এই ফুলগুলি ফুটিয়াছিল এগুলি কোন্ সুখী পরিবারের নয়নানন্দ, স্নেহপুত্তলী ছিল? কিন্তু হায়! হিংসার কি শোচনীয় পরিণাম—পিতৃহারা, গৃহহারা হইয়া এই কুমারীগণ আজ বিদেশে শত্রুর দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ।"

যে বন্দিনীর মুখখানি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, চোখদুটি অধিক বিষণ্ণ, তাহার দিকে ফিরিয়া রাণী দিয়ানিরা বলিলেন—"তোমার নাম কি বৎস? তোমার পিতা মাতা কে? অভাগিনি, তুমি বিবাহিতা না কুমারী? সম্ভবতঃ তুমি কুমারী এবং তোমার জন্ম যে মহৎকুলে তাহার সন্দেহ নাই। বন্দিনী অবনতনয়নে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া রাণী লাইকাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বালিকাটি কে? মহাকুলে ইহার জন্ম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর সকলের দিকে দেখ, আর

উহার মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখ, আর কাহারও বোধ হয় আপন অবস্থার প্রতি এতদূর দৃষ্টি পড়ে নাই।"

লাইকাস বালিকাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া রাজ্ঞীর প্রশ্ন অতিক্রম করিয়া গেলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন—"গৃহত্যাগ অবধি বালিকা একটি বাক্যও উচ্চারণ করে নাই, সমস্ত পথ অবিরল অশ্রুপাত করিয়াছে।" বন্দিনীদিগকে লইয়া লাইকাস ত্বরিতপদে প্রাসাদের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে হার্কিউলিসের আগমন সংবাদ রাণীর নিকট আনিয়াছিল সে তখন আসিয়া বলিল—"মহারাণি, সমস্ত কথা আপনি শুনেন নাই, লাইকাস আপনাকে প্রতারণা করিয়া গেল। নগরে সে একরূপ কথা প্রচার করিয়াছে, আপনার নিকট অন্যরূপ বলিল। ইউরিটাসের সহিত হার্কিউলিসের যুদ্ধের কারণ ইকাইটাসের মৃত্যু বা অপর কিছু নহে, যুদ্ধের কারণ ঐ বালিকা। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আপনি যে বালিকা সম্বন্ধে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, আপনার স্বামী হার্কিউলিস তাহারই প্রণয়ে মুগ্ধ। আমার বাক্য যে সত্য সে সম্বন্ধে আমি সহস্র প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারি।"

বজ্রাহতা দিয়ানিরা ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"তুমি উহার নাম জান?" দুর্ম্মুখ বলিল—"নিঃসন্দেহ!—সে নাম যে সে নাম নহে!! এই বালিকাই আইওল্ (Iole), ইউবিয়ার রাজকুমারী ইউরিটাসের দুহিতা".

রাণীর আহ্বানে লাইকাস পুনরায় আসিলেন। আসিয়াই তিনি বলিলেন—"আমি এখনই প্রভুর নিকটে ফিরিয়া যাইতেছি। মহারাণীর নিকট হইতে কোনও বার্ত্তা তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতে হইবে কি?

রাণী বলিলেন—"এত ত্বরা কিসের জন্য? তোমার আরও অনেক কথা বলা অবশিষ্ট রহিয়াছে। দূত বলিল—"যাহা জানিতে চাহেন আজ্ঞা করিলেই শুনিতে পাইবেন।"

তখন তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাণী বলিলেন—"তবে সত্য বল, যাহাকে তুমি লইয়া আসিয়াছ সে রমণী কে?

"সে ইউবিয়ার একজন অধিবাসিনী, তাহার সম্বন্ধে এইমত বলিতে পারি।

পূর্ব্বোক্ত হতভাগ্য তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া কহিল—"তোমার প্রভুপত্নীকে এইরূপে প্রতারণা করিতে তুমি সাহস করিতেছ?

লাইকাস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"কি? তুই আমার সহিত এইরূপে কথা কহিতে সাহস করিতেছিস?

নির্ব্বোধের মত রসনাকে রোধ করিবার চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া সে বলিল—"কেন এই কিছুক্ষন পূর্ব্বে তুমি না বলিলে যে এই রমণী Iole, ইউরিটাসের কন্যা, এবং হার্কিউলিস্ বহুদিন হইতেই ইহার পাণিপ্রার্থনীয়।

লাইকাস তাহার কথায় উত্তর দিতে অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া রাণীকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন — "এই বাতুল কে? ইহাকে বিদায় করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। এই অলসের অর্থহীন প্রলাপ শুনিয়া কালহরণ করিবার অবসর আমার নাই।"

কিন্তু রাণীর হৃদয়ে পত্নীর সমস্ত শঙ্কা-জনক সংশয় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। লাইকাসের কথা তাঁহার চিত্তে শান্তি আনিতে পারিল না। তিনি বলিলেন— "লাইকাস! পৃথিবীমধ্যে পবিত্রতম বস্তু যাহা কিছু আছে সে সকলের নামে তোমায় অনুরোধ করিতেছি, তুমি সত্য কথা বল। কিসের ভয় করিতেছ? আমি কি হার্কিউলিসের ধর্ম্মপত্নী নহি? তুমি কি মনে কর তাঁহার বীরহৃদয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর আসন হইবে আমি সে আশঙ্কা করি? আমি এত দুর্ব্বল নহি। গোপন করিবার প্রয়োজন কি? বল, তিনি কি তোমাকে সত্য গোপন করিবার আদেশ দিয়াছেন, না তুমি আপনা হইতে এইরূপ আচরণ করিতেছ? সত্য একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে। এই কাপুরুষোচিত প্রতারণা ত্যাগ করিয়া সরল ভাবে ও নির্ভয়ে যাহা সত্য তাহাই বল।

লাইকাস তখন লজ্জিত হইয়া কহিলেন —"যাহা শুনিয়াছেন সকলই সত্য। কিন্তু মনে করিবেন না যে আমার প্রভুর আদেশে আমি এই প্রতারণা করিয়াছি। এই দোষ—যদি ইহা দোষ হয়—সমস্তই আমার। জননী মহারাণীর হৃদয়ে আঘাত দিতে আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই প্রতারণা করিয়া ক্ষণ-কালের জন্য আপনাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

চিন্তামগ্ন দিয়ানিরা তখন বলিলেন— "ভালই, কোনও ক্ষতি নাই! ফিরিবার সময় আমার নিকট হইতে তোমার প্রভুর জন্য উপহার লইয়া যাইও, দিয়ানিরার নিকট হইতে দূত রিক্তহস্তে তাঁহার কাছে ফিরিবে ইহা সঙ্গত নহে।

আপন সহকারিণীগণের মধ্যে আসিয়া দিয়ানিরা আর আত্মগোপন করিলেন না। প্রবল আত্মগরিমা লাইকাসের সমক্ষে তাঁহাকে উচ্চশির করিয়া রাখিয়াছিল, এখন বিশ্বস্তহৃদয়া সমব্যথিত সহচারীর মধ্যে আসিয়া সংযমের রশ্মি ছিন্ন হইয়া গেল। হৃদয়দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"হায়, ইউবিয়ার এই তরুণ সুন্দরী স্বামীর হৃদয়ে আমার স্থান অধি-কার করিয়াছে।—কিন্তু একটি মন্ত্র আমার কাছে রহিয়াছে তাহাদ্বারা আমার আসন অটল রাখিতে আমি সমর্থ হইব। বিবাহের পরে পিত্রালয় ছাড়িয়া স্বামীর সহিত আসিবার সময় একটি ঘটনা ঘটিয়া ছিল, পথে নদী পার হইবার জন্য যাত্রীকে নিশাসের সহায্য লইতে হইত। এই নিশাস অর্দ্ধ মনুষ্য অর্দ্ধ অশ্বাকৃতি। সেই পৃষ্ঠে করিয়া সকলকে নদী পার করিয়া দিত। সে আমাকে পার করিয়া দিবার জন্য পৃষ্ঠে উত্তোলন করিল, কিন্তু পার না করিয়া দুরাত্মা আমাকে লইয়া পর্ব্বতের

দিকে ছুটিল। আমি চীৎকার করিয়া হার্কিউলিসকে ডাকিলাম এবং অবিলম্বে তাঁহার অব্যর্থ শরে পাপিষ্ঠ ভূতলশায়ী হইল। মৃত্যুকালে ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল 'ইনিউনচুহিতা, এই পৃথিবীতে তোমাকেই আমি সর্ব্বশেষে আমার পৃষ্ঠে বহন করিলাম, যাইবার সময় আমার স্মৃতিচিহ্নরূপে তোমাকে কিছু দান করিতে চাহি। আমার দেহনিঃসৃত এই শোণিত তুমি সযত্নে রক্ষা করিও। যে শর আমার কালস্বরূপ হইল তাহা মহানাগ শতশীর্ষ হাইড্রার বিষে লিপ্ত। আমার প্রাণের পক্ষে এই বিষ শোচনীয় হইলেও ইহার আশ্চর্য্য গুন আছে। আমার শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা এক অপূর্ব্ব শক্তি ধারণ করিয়াছে। হার্কিউলিসকে যদি চিরদিন তোমার প্রেমে বাঁধিয়া রাখিতে চাও তাহা হইলে আমার এই শোণিত সংগ্রহ করিয়া লও। তাঁহার মন চঞ্চল দেখিলে এই শোণিতে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া তাঁহাকে পরিধান করিতে দিও তাহা হইলে কখনও বিফল হইবে না। এই কথা বলিয়াই Nessus এর মৃত্যু হইল। আমি এতদিন পর্য্যন্ত ইহা যত্নে রক্ষা করিয়াছি এখন ব্যবহার করিবার সময় আসিয়াছে। তোমরা কি বল?

ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া সঙ্গিনীগণ ইহাতে তাহাদের সম্মতি জানাইল।

ক্রমশঃ

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

যমালয় হইতে প্রত্যাগত।

১

একে একে পাঁচটী পুত্র কন্যা অকালে কালকবলে নিপতিত হওয়ায় হারাণ চন্দ্র বড় অবসন্ন হইয়া পড়িল। হারাণ চন্দ্র দাস, জাতিতে কৈবর্ত্ত। সে কৃষিকার্য্য দ্বারা কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তাহার কিছু সঞ্চয় না থাকিলেও পরিশ্রম লব্ধ সামান্য অর্থে দিন একরূপ চলিয়া যাইত, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। কিন্তু ভগবান্ যাহার প্রতি বিমুখ, তাহার সুখ শান্তির আশা কোথায়? অথবা ভগবানের দোষ দেওয়া অন্যায়; মানুষ নিজের কর্ম্মফলে নিজে ক্লেশ পায়, অজ্ঞানতা বশতঃ না বুঝিতে পারিয়া ভগবানের দোষ দেয়। হারাণ ও তাহাই মনে করিত। "ভগবান আমার এমন সর্ব্বনাশ কেন করিলেন' এই কথা সে সর্ব্বদা ভাবিত। হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন, প্রিয়তম পুত্র কন্যা গুলিকে হারাইয়া হারাণচন্দ্র শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পরে যখন তাহার একমাত্র অবশিষ্ট পুত্র দুলালচাঁদের মৃত্যু হইল, তখন তাহার হৃদয়ের বন্ধন একেবারে ছিঁড়িয়া গেল।

হারাণ চন্দ্রের ক্লিষ্ট চিত্ত, শীর্ণ দেহ, সে আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। সে একেবারে শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল।

২

অন্ত্যজ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও হারাণের গৃহিনী যেরূপ সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য-শীলতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয় এবং একান্ত অন্তরে তাহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। সে যে নীচ কৃষক রমণী! উচ্চ শিক্ষা দূরে থাক, কোনরূপ সামান্য শিক্ষার বাতাসও তাহার গায়ে কখনও লাগে নাই! সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে, তাহাও সে জানিত না। কিন্তু সেই নিরক্ষর অসভ্য কৈবর্ত্তরমণীর যেরূপ সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্যশীলতা, এবং কর্ত্তব্য বুদ্ধি ছিল, তাহা আমাদের মধ্যে কয়জনের আছে? আমরা আবার উচ্চশিক্ষার অভিমান করি? আমরা আবার আভিজাত্যের গৌরব করি!!

এই সময়ে হারাণের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সেই অবস্থায়, অসহ্য পুত্র-শোক-শেল বক্ষে ধরিয়াও, আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে বুঝিতে পারিল, এ সময়ে সে অধীরা হইলে তাহার স্বামীর জীবন রক্ষা হওয়া দুরূহ। সে নিজের বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া, শোকার্ত্ত, দুর্ব্বল, স্বামীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। পতিব্রতা, স্নেহময়ী ভার্য্যার ঐকান্তিক যত্ন ও শুশ্রূষার গুণে, হারাণচন্দ্র ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যলাভ করিতে লাগিল।

যথা সময়ে হারাণের পত্নী একটী পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিল। ভাগ্যহীন দম্পতির শোক ক্লিষ্ট, নিরাশ হৃদয়ে আবার আশার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল।

৩

উপর্য্যুপরি শোকের আঘাত পাইয়া হারাণের পত্নীর হৃদয় কিছু কঠোর ভাব ধারণ করিয়াছিল। সে নবজাত পুত্রকে ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল। স্বামীকে বুঝাইয়া বলিল, "আমরা উহাকে বড় অধিক ভালবাসিব না। যদি আমাদের হ'য়ে এসে থাকে, আর ভগবান পায়ে রাখেন, তবে অবশ্যই থাকিবে, আর তাহা যদি না হয়, যাঁর বস্তু, তিনিই গ্রহণ করিবেন, আমরা কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিব না, তবে কেন মিথ্যা মায়া বাড়াইব?" হারাণ, পত্নীর বাক্য সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিল, কিন্তু যখনই সেই ক্ষুদ্র শিশুর সুন্দর মুখ খানির দিকে চাহিত, তখনই তাহার স্নেহের উৎস উচ্ছলিত হইয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে নয়ন পল্লব ভিজিয়া যাইত। হারাণ সর্ব্বদা একমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিত, "দয়াময় প্রভু! যাহা হারাইয়াছি তাহা আর পাইব না, এখন শেষ জীবনে যাহা দিয়াছ, তাহা আর ফিরিয়া নিও না।"

হারাণের স্ত্রী কিছুই ভাবিত না। তাহার একই কথা, "যাঁহার ধন, তিনি রাখিলে কেহই মারিতে পারিবে না, আর তিনি যদি নেন, তাহা হইলে ধরিয়া

রাখিতে কাহারও সাধ্য নাই।” যাহার ভগবানের প্রতি এমন মনের বিশ্বাস এমন নির্ভরতা থাকে, ভগবান তাহাকে কখনও ত্যাগ করেন না।

৪

শিশুর নাম হইল, কুড়ানচন্দ্র। পথে কুড়াইয়া পাওয়ার মত অধিক বয়সের সন্তান বলিয়াই হউক, অথবা পাঁচ ছয়টী সন্তান অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ায় অবহেলা করিয়াই হউক, মাতা শিশুর কুড়ানচন্দ্র নাম রাখিল।

কুড়ানচন্দ্র ক্রমে বড় হইতে লাগিল। এদিকে কালের চিকিৎসায় তাহার জনক জননীর ক্ষত হৃদয় ক্রমে অল্পে অল্পে শুষ্ক হইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষত শুকাইলেও তাহার দাগ যায় না। সব যায়, স্মৃতি যাইবার নয়। হারাণচন্দ্র অনেক সময় অতীতের কথা চিন্তা করিত। আজ তাহার ঘরে ছেলে পুলে ধরিত না। বড় ছেলে থাকিলে এতদিনে কার্য্যক্ষম হইত। তাহাকে কত সহায়তা করিত, হয়তঃ এতদিন বধূ ঘরে আসিত। এই সব ভাবিতে ভাবিতে তাহার, দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। অমনি কোথা হইতে কুড়ানচন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আধ আধ কোমল-স্বরে বলিত, “বাবা! কাঁদিস্ কেন?”

হারাণের আর রোদন করা হইত না। চোখের জল চোখে চাপিয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিত। একদিন মাতার চোখে জল দেখিয়া কুড়ান বড়ই কাঁদিয়াছিল। সেই অবধি বুদ্ধিমতী জননী আর কোন দিন পুত্রের সম্মুখে চোখের জল ফেলে নাই। এক দুই করিয়া কুড়ানচন্দ্রের পঞ্চম বৎসর উত্তীর্ণ হইল।

৫

হারাণচন্দ্র শৈশবে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় কিছু দিন পড়িয়াছিল, সেই জন্য বিদ্যার আস্বাদ তাহার একটু জন্মিয়াছিল। তাহার চিরদিনেরই ইচ্ছা, একটী ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হয়, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার সন্তান গুলি অকালেই তাহাকে ছাড়িয়া গেল। শেষে কুড়ানচন্দ্রের জন্মের পর হইতে বহুদিনের লুপ্ত আশা, আবার তাহার হৃদয়ে নবীন ভাবে জাগিয়া উঠিল। হারাণ চন্দ্র নব উৎসাহে পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইতে মনস্থ করিল, নিজেই ঘরে বসিয়া একটু একটু পড়াইতে লাগিল। কুড়ানচন্দ্র সেরূপ মেধাবী ছিল না। তবু পিতার একান্ত যত্নে অক্ষর পরিচয় শেষ করিয়া “ফলা বানান” শিখিতে লাগিল। হারাণের আনন্দের সীমা নাই. বিদ্যা শিক্ষায় পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া তাহার মনে আশা হইল যে কালে এই বালক আদালতের পেয়াদা হইয়া দশটাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে অথবা হয়তঃ সে থানার জমাদার হইতে পারিবে। অশিক্ষিত হারাণচন্দ্রের সরল হৃদয়ে ইহা অপেক্ষা উচ্চ আশা কোন দিন স্থান পায় নাই।

আরও, তখনকার দিনে সাধারণ লোকে এই দুইটী পদ প্রার্থনীয় মনে

করিত, উহাতে উপার্জ্জনও যথেষ্ট ছিল। এখন দারগাকে লোকে যতটা সম্মান করে, তখন জমাদারকে তাহার অপেক্ষা অধিক সম্মান ও ভয় করিত, বিশেষতঃ পল্লী গ্রামে জমাদারের প্রতিপত্তি ও আধিপত্য অসীম ছিল, তাহাদের দেখিলে একটা ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের অধিপতি বলিয়া মনে হইত।

৬

কুড়ান চন্দ্র দুই বৎসরের মধ্যে নামতা পর্যান্ত শিখিয়া ফেলিল। পাড়ার জমীর শেখ গুরুর একটী ছোট খাট পাঠশালা ছিল। দশ পনের জন বালককে জমীর গুরু শিক্ষা দান করিত। হারাণচন্দ্র সেখজীকে ধরিয়া পড়িল। তাহার অনুরোধে জমীর তাহার পুত্রটীকে আপন পাঠশালায় লইতে সম্মত হইল। হারাণ কুড়ানচন্দ্রকে জমীর গুরুর হাতে সমর্পণ করিয়া তাহার শিক্ষা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইল।

কুড়ান প্রত্যহ প্রাতে পাঠশালায় যায়। সেখান হইতে বাটী আসিয়া স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া বৈকালে আবার যায় এবং অল্প বেলা থাকিতে বাটীতে আসে। গুরুজী তাহাকে বড় ভাল বাসেন। ছেলেটী বড় শান্ত ও গুরুর নিতান্ত অনুগত। গুরু যখন যাহা আদেশ করেন, বালক তদ্দণ্ডেই তাহা সম্পন্ন করে।

একদিন সকালে কুড়ান পাঠশালায় গিয়াছে। অনেক বেলা হইল, তবু তাহার দেখা নাই। জননী রন্ধনাদি করিয়া বসিয়া আছে। হারাণ ভাত খাইতে আসিয়া দেখিল, পুত্র তখনও পাঠশালা হইতে প্রত্যাগমন করে নাই। সে আহার না করিয়া তাড়াতাড়ি জমীর গুরুর পাঠশালায় গেল। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিল, একখানি মাদুরের উপরে শুইয়া কুড়ানচন্দ্র ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। বিষণ্ণ ভাবে গুরু তাহার মাথার কাছে বসিয়া আছে। আরও চারি পাঁচটা বালক তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। হারাণ শুনিল, একটু আগে কুড়ানের দুইবার ভেদ ও একবার বমি হইয়াছে। গুরুজী তাহাকে কর্পূরের আরক খাওয়াইয়া দিয়াছেন। হারাণ কাছে যাইয়া ডাকিল, "কুড়ান! বাবা আমার!" কুড়ান পিতার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার রক্তবর্ণ নিস্তেজ চক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি দেখিয়া হারাণের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। জমীর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "হারাণ! তুমি ভাবিও না, যে আরক খাওয়াইয়াছি, খোদার ইচ্ছায় কুড়ান উহাতেই ভাল হইয়া যাইবে। আমি এখনই তোমার কাছে লোক পাঠাইতেছিলাম, তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, এখন ইহাকে বাড়ী নিয়া যাও আমিও সেখানে যাইতেছি।'

হারাণ, পুত্রকে বুকে করিয়া গৃহে লইয়া গেল।

৭

প্রস্তুত অন্ন পড়িয়া রহিল, কাহারও তাহা মনে রহিল না। স্বামী স্ত্রী অনাহারে পীড়িত পুত্রের মাথায় কাছে বসিয়া অনিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। হারাণের স্ত্রী মনের এইরূপ অস্থিরতার মধ্যেও স্বামীকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল। স্বামী যে মুখের ভাত ফেলিয়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই, কিন্তু হারাণ কোন মতে আহার করিতে সম্মত হইল না।

ক্ষুদ্র পল্লী, কেবল ইতর লোকেরই বাস। হিন্দুর মধ্যে দুই চারি ঘর কৈবর্ত্ত ও নাপিত আছে। চিকিৎসক গ্রামে আদৌ ছিল না। জমীর সেখ হাকিমি মতে চিকিৎসা করিত। কুইনাইন, ক্যাম্ফর প্রভৃতি দুই একটী ইংরেজী ঔষধ তাহার কাছে থাকিত। এক কথায় জমির সেখ সেই ক্ষুদ্র পল্লীর 'নেটিব ডাক্তার'। কাহারও সামান্য একটু অসুখ হইলেই জমীরের কাছে আসিত, জমীরও বিনা বাক্যব্যয়ে ঔষধ দিত। তাহাতে কাহারও উপকার হইত, কাহারও হইত না। কিন্তু সকলেই বৃদ্ধ সেখজীকে সম্মান করিত।

জমীর সমস্ত দিন হারাণের বাড়ীতে বসিয়া আছে। ঔষধও চলিতেছে কিন্তু উপকার কিছুই হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে জলের মত ভেদ হইতেছে। বমিও দুই একবার হইয়াছে। বালক ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কথা কহিবার আর শক্তি রহিল না। পিপাসায় কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, গাত্রদাহ এবং পিপাসার যন্ত্রণায় বালক ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। এই ভাবে রাত্রি কাটিল। যখন প্রভাত-অরুণ পূর্ব্বদিক লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়া উদয় হইতেছিল, সেই মুহূর্ত্তে হতভাগ্য হারাণ ও তাহার চির-দুঃখিনী পত্নীর মস্তকে বজ্রাঘাত পতিত হইল, তাহাদের অন্ধের নড়ি, জীবনের বন্ধন, কুড়ানচন্দ্র তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি হারাণের স্ত্রী আর সহ্য করিতে পারিল না। অনাহার-ক্লিষ্টা, শীর্ণ-শরীরা অভাগিনী উচ্চ আর্ত্ত-নাদ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

সকাল হইতে মেঘ করিয়া ছিল, বেশ এক পস্‌লা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। হারাণের অভাগিনী পত্নী এখনও সেই ভাবে পড়িয়া আছে। তাহার মূর্চ্ছাপনোদনের জন্য সকলে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু জ্ঞান সঞ্চারের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। দুই তিন জন লোক হারাণকে ধরিয়া বসিয়া আছে।

৮

জমীর সেখ এবং হারাণের আত্মীয়-বর্গের ইচ্ছা ছিল, বালকের দেহ অবি-লম্বে স্থানান্তরিত করা হয়। সকলেরই সেই মত ছিল, কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি আসায় তাহাদের সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। সকলেই উৎসুক ভাবে

বৃষ্টি থামিবার প্রতীক্ষা করিতেছে, অকস্মাৎ প্রাঙ্গণে পতিত বস্ত্রাচ্ছাদিত বালকের দেহ যেন একটু নড়িয়া উঠিল। সকলের সোৎসুক দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল। হঠাৎ পরিষ্কার স্বরে বস্ত্রের মধ্য হইতে 'মা' 'মা' শব্দ হইল। সকলে চমকিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে হারাণের স্ত্রী ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিতেছিল। তাহার কর্ণে সেই শব্দ প্রবেশ করিল। সে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া ছুটিয়া বালকের নিকটে গেল। ইত্যবসরে বালক যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। জননী বুকের ধন বুকে তুলিয়া আনিল। কুড়ানচন্দ্র মাতার স্নেহময় বক্ষে মস্তক রাখিয়া কিছুক্ষণ স্থির ভাবে রহিল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া আসিল। এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা মুখে মুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। অনেক দূর হইতে কুড়ানচন্দ্রকে দেখিতে লোক আসিতে লাগিল।

৯

একটু স্থির হইয়া কুড়ান বলিতে লাগিল—

"মা! আমার কি হইয়াছিল, কিছুই মনে নাই। আমার মনে হয়, আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুমের ঘোরে একটি বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন আমি শুইয়া আছি, এমন সময়ে দুটো ষণ্ডা গুণ্ডার মত লোক আসিয়া হঠাৎ আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। আমি কত কাঁদিলাম কিছুতেই তাহারা ছাড়িয়া দিল না। দুইজনে আমাকে ধরিয়া নিয়া চলিয়া গেল। অনেক দূর গিয়া বড় একটা বাড়ী দেখিলাম; তেমন বাড়ী মা! আমি কখনও দেখি নাই। সেই বাড়ীর মধ্যে আমাকে টানিয়া নিয়া গেল। সেই বাড়ীর মধ্যে বেশ একটা বড় ঘরে এক খানা উঁচু চৌকীর উপরে মুখে দাড়ী মোটা একজন বাবু বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া লোক দুটিকে বকিতে লাগিলেন। সব কথা আমার মনে নাই। সেই বাবু নিজের হাতে আমার বাঁধন খুলিয়া দিলেন, আর আমার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কুড়ান! তুমি বাড়ী যাও।"

আমি বলিলাম, "বাবু! আমি যে পথ চিনি না, আপনার লোক আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে," বলিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তখন বাবু আমার হাতে একটা পাকা কলা দিয়া বলিলেন, "এইটী খেতে খেতে যাও, তা হ'লেই তুমি বাড়ী ফিরে যেতে পারবে।"

আমি সেই কলা খাইতে খাইতে আসিলাম। কলাটী যেই শেষ হইল, অমনি আমার ঘুম ভাঙ্গিল।"

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, কুড়ানের পদাঙ্গুলি হইতে সর্ব্ব শরীরে কাল কাল ডোরা ডোরা দাগ পড়িয়া গিয়াছে। এই দাগ তাহার শরীরে অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল।

১০

এই ঘটনার পরে অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। হারানচন্দ্রের মনের বাসনা সফল হইয়াছে। কুড়ানচন্দ্র পুলিশে ভর্ত্তি হইয়া কার্য্যদক্ষতাগুণে জমাদারের পদে উন্নীত হইয়াছে। হারাণ চন্দ্র ও তাহার পত্নীর সুখের দিন আসিয়াছে। কুড়ানচন্দ্র জমাদার হইয়া সম্মান ও অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। হারাণ কুড়ানের বিবাহ দিয়া সুন্দরী বধূ ঘরে আনিয়াছে।

কুড়ানচন্দ্রের স্বভাবের গুণে সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সকলেই তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিত "যমালয়ের ফেরত।"

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।
বারুইপাড়া, খুলনা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লেডী হার্ডিঞ্জ প্রদত্ত বৃত্তি—লেডী হার্ডিঞ্জ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণা যে সকল ছাত্রী দিল্লীতে স্ত্রীলোকগণের মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে সম্মত হইবেন, বর্ত্তমান সময় হইতেই এইরূপ আঠার জন স্ত্রীলোককে মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

লেডী হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ-- আগামী শীত ঋতুতে স্ত্রীলোকগণের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য দিল্লীতে মেডিকেল কলেজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হইবে এরূপ শুনা যাইতেছে।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীগণের বিশেষ বৃত্তি—

বর্ত্তমান বৎসরে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে :-

২৫৲ টাকা বৃত্তি—মলিকোহেন, লরেটো হাউস।
২০৲ " ক্ষিতী গুহ ডায়োসেসন কলেজ।
২৫৲ ,, চারুশীলা রায় বেথুন কলেজ।

ব্রজমোহন দত্ত রচনা পুরস্কার—

"পারিবারিক জীবনে নারীজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ" বিষয়ে রচনা লিখিয়া আমাদের সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবী প্রথম স্থান অধিকার করায় ৪৫৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

কলিকাতার পরিসর বৃদ্ধি—

সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ও ভবানীপুর রোড কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এইরূপ শুনা যাইতেছে

পুরাতন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল এখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বলিয়া অভিহিত হইবে।

রাজপরিবারে বিবাহ—

বিলাতের সেণ্ট জেম্‌স চেপল ভজনালয়ে প্রিন্স আর্থার অব কনটের সহিত ডাচেস্‌ অব কাইরোর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভলটার্ণো জাহাজ দগ্ধ—

গত ২রা অক্টোবর ভলটার্ণো নামক একখানি সাত শতাধিক আরোহীপূর্ণ জাহাজ উত্তর আমেরিকার হাউলকায় সহরে যাত্রা করিতেছিল। অকস্মাৎ জাহাজের নিম্ন দেশে অগ্নি লাগিয়া জাহাজখানি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এই সঙ্গে যে কত লোকের জীবন বিনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

পণ।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি ডাক্তার্ সেনের পসার জমিয়া গিয়াছিল। লোকটার গুণও অনেক ছিল। তিনি একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন। তাঁহার সহৃদয়তাও যেমন, সৌজন্যও সেইরূপ। কত দরিদ্রকে যে তিনি বিনা ফিতে দেখিতেন ও বিনা ব্যয়ে ঔষধ দিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিলাত ফেরত সমাজেও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। কোন ডিনার বা টি-পার্টিতে তিনি বাদ পড়িতেন না। রমণী ও পুরুষ সকলেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ।

কিন্তু পসার সত্বেও মাসিক আয়ে তাঁহার খরচ কুলাইত না। তিনি দস্তুর মত সাহেব। তাঁহার সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম, ডাইনিংরুম, সিটিংরুম, কনসল্‌টিংরুম প্রভৃতি ত ছিলই, আবার তদনুযায়ী নিমান1, বেহারা, খার্ন্সাচীও তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। বাজে খরচও তাঁহার বিস্তর ছিল। বাজী রেখে ব্রীজ খেলা, ঘোড় দৌড়ে টাকা দেওয়া প্রভৃতি ছোট বড় রকমের জুয়া খেলায় তাঁহার অনেক টাকা খরচ হইত। ইহার উপর ডিনারের খরচ, মদের খরচ ত আছেই। সুতরাং আয় অপেক্ষা তাঁহার ব্যয় অধিক হইত। কর্জ্জের হিসাব তাঁহার ক্রমাগতই বাড়িতেছিল।

যাহা হউক, এ সব কিছু তিনি বড় গ্রাহ্য করিতেন না। দিনের বেলায় নিজের কাজে এবং সন্ধ্যাকালে বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ ও ফুর্ত্তিতে তাঁহার সময় নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যাইত। অর্থের দুশ্চিন্তা তাঁহাকে কখনও ব্যাকুল করে নাই।

কিন্তু ইদানীন্তন তিনি বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। একদিন ডিনারের পর সুস্নিগ্ধ বাসন্তী পূর্ণিমার উচ্ছসিত জোৎস্নালোকে তিনি মিস্ করের সহিত নির্জ্জন

উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে সহসা সেই কুসুম সুবাসিত মৃদু বাহিত বসন্ত বায়ু ও দীপ্ত স্বর্ণময় জ্যোৎস্না-কিরণ তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিল। অবশ্য মিস্ করের সগর্ব্ব সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট মুখশ্রীও অনেক দিন ধরিয়াই ইহার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। কিন্তু সেই উজ্জ্বল দিন, চন্দ্রালোক, স্নিগ্ধ সান্ধ্য-সমীরণ ও তরুণীর উদ্বেলিত রূপের তরঙ্গ একত্রে মিলিত হইয়া ডাক্তার সেনকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল। ইউরোপে যুনানী রূপসী-গণের তীব্রতর কটাক্ষ তিনি হেলায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে জগজ্জয়ীরূপ কত বার তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু কোনদিন তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে পারে নাই। সে দিন অকস্মাৎ তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আর পরিণাম চিন্তার অবসর রহিল না।

এইরূপ করিয়াই কিছুদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু ক্ষত হৃদয়ের তীব্র বেদনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। এ দিকে মিষ্টার করের দৃঢ় পণ যে অর্থহীনের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন না। তাঁহার বিশ্বাস যোগ্য ব্যাঙ্কে যাহার টাকা গচ্ছিত নাই সে তাঁহার সর্ব্বগুণ-সম্পন্না কন্যার যোগ্য পাত্র হইতে পারে না।

কিন্তু ডাক্তার সেনের তহবীল যে একেবারে শূন্য। সঞ্চিত অর্থের ত কথাই নাই, অপিচ তিনি ঋণে আবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে মিষ্টার করের নিকট তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করা ধৃষ্টতা মাত্র।

অতি নিরাপদে, নির্ব্বিঘ্নে ও মনের সুখে তিনি জীবন যাপন করিতেছিলেন, কোথা হইতে আপদ জুটিয়া তাঁহার মনের শান্তি হরণ করিল। মিস্ করের স্নিগ্ধরূপও ভুলিতে পারেন না, তাহার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করাও সুকঠিন। তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

দৈবের কৃপায় সিঙ্গাপুরে তাঁহার একটা বড় রকমের কাজ যুটিয়া গেল। তথায় তাঁহাকে তিন বৎসর কাল অবস্থান করিতে হইবে। অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিবার ইহা একটি অব্যর্থ সুযোগ বুঝিয়া ডাক্তার সেন কর্ম্মটী গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, তহবিল পূর্ণ করিয়া তিন বৎসর পরে তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন মিস্ করের করগ্রহণ সম্বন্ধে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিবে না। এই আশাতেই তিনি আজ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশ যাত্রার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

বিদায়ের দিনে প্রণয়ী যুগলের মধ্যে তেমন উচ্ছ্বাসের আড়ম্বর দেখা গেল না। উভয়েরই হৃদয় বোধ হয় পূর্ণ ছিল। ডাক্তার সেন কহিলেন, "আমি আজ চলিলাম। আবার তিন বৎসর পরে দেখা হবে।"

মিস্ কর। যাবার আগে তুমি আমায় নিকট একটি প্রতিজ্ঞা কর।

ডাক্তার সেন। কি প্রতিজ্ঞা?

মিস্ কর। শপথ কর যে সেখানে তুমি কখনও জুয়া খেল্‌বে না, আর বেশী মদ খাবে না।

ডাক্তার সেন। আচ্ছা! তোমার কাছে আজ আমি শপথ কচ্ছি, যে আমি আর কখনও জুয়া খেল্‌ব না বা মদ খেয়ে মাত্‌লামী কর্‌ব না।

মিস্ কর। আজ ১০ই ফাল্গুন, তুমি আবার কবে আস্‌বে?

ডাক্তার সেন। ৩ বৎসর পরে ১০ই ফাল্গুন আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। যদি তা না হয়, তবে জেন আমি মরে গেছি।

মিস্ কর। আমি তোমার জন্তে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব।

ডাক্তার সেন। এত দিন অপেক্ষা কর্‌তে পারবে?

মিস্ কর। নিশ্চয়ই! তিন বৎসর দেখিতে দেখিতে কেটে যাবে।

ডাক্তার সেন। তুমি আমাকে চিঠি লিখ্‌বে না?

মিস্ কর। চিঠিপত্র না লেখাই ভাল। কি বল?

ডাক্তার সেন। বেশ তোমার একটা কিছু স্মরণ চিহ্ন আমাকে দাও।

তাহার চম্পকাঙ্গুলী হইতে হীরক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া মিস্ কর কহিল, "এই নাও—এই আমার স্মরণ চিহ্ন।

ডাক্তার সেন। এটা তোমাকেই আবার ৩ বৎসর পরে আমি ফিরাইয়া দিব। তুমি আমার স্মৃতি কিছু রাখবে না?

মিস্ কর। তোমার ফটো ও কতক গুলি চিঠি আমার কাছে আছে। তোমাকে আমি কখনও ভুলিব না।

মিস্ করের কণ্ঠস্বর যেন বাষ্পরুদ্ধ হইল।

মিস্ করের কথা মিথ্যা হয় নাই। দেখিতে দেখিতে ৩ বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন স্নিগ্ধ নির্জ্জন দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ডাক্তার সেনের জাহাজ খিদিরপুর ডকে আসিয়া নোঙ্গর করিল।

ডাক্তার সেনের নিকট-আত্মীয় বড় কেহ ছিল না। তিনি একেবারে বেঙ্গল ক্লাবে গিয়া উঠিলেন। বহুদিন পরে পুনর্ব্বার সেই ক্লাব-গৃহে প্রবেশ করিবার সময় উল্লাসে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। স্বদেশ যে কত আদরের সামগ্রী প্রবাসীরাই তাহা বুঝিতে পারে।

ক্লাবে সকলেই তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। পুরাতন বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, অপরিচিত, সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল—শত সহস্র প্রশ্নে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ডাক্তার সেনও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বন্ধুবর্গের স্নেহ ও পরিচিত জনের প্রীতি যে কত মধুর আজ তিনি আবার নূতন করিয়া অনুভব করিলেন। তাঁহার মনটা বসন্তের দক্ষিণ বায়ুর মতই উল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু তখনও তাঁহার সুখ পূর্ণ হয় নাই। তখনও তাঁহার হৃদয় মিস্ করের সংবাদ শ্রবণে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বিদায় কালীন বালিকার

সেই সজল নয়ন যুগল এখনও তাঁহার অন্তরে জ্বলিতেছিল। তাহার প্রতিজ্ঞা-বাণী "আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।" এখনও তাঁহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে ছিল। মিলনের আর দুই দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু আর অপেক্ষা করা যায় না।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিলে দলে দলে মেম্বরগণ আসিতে লাগিল। ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক-লাইট স্ফুরিত হইল, কক্ষে কক্ষে তাস খেলা চলিতে লাগিল। হুইস্কী ও সোডা লইয়া খানসামা দল ঘুরিতে লাগিল।

ডাক্তার সেন স্তম্ভিত হইলেন। সেই সব—সবই পরিচিত। আজও সেই বৃদ্ধ যোগেশ বাবু কম্পিত হস্তেতাস খেলিতেছে. আজও সেই যতীন ফাঁকি দিয়া তাস বদলাইবার অবসর খুজিতেছে। তিন বৎসরের পরেও আজ তিনি কাহারও কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

কেহ কেহ তাঁহাকে তাস খেলিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু তাসের নেসা তিনি অনেকদিনই কাটাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞা কেহ টলাইতে পারিল না। তিনি দর্শক শ্রেণীভুক্ত হইয়া কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল। ডাক্তার সেন সম্মুখে ফিরিতেই আগন্তুক কহিলেন, "ডাক্তার সেন, অনেকদিন পরে আপনাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। আপনি বোধ হয় আমাকে চিন্‌তে পার্‌চেন না?"

ডাক্তার সেন অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "ধন্যবাদ! কিন্তু"—অপরিচিতকে তাঁহার চেনা চেনা মনে হইল, কিন্তু তাঁহার নাম মনে আসিল না।

আগন্তুক। আপনি এখনও আমাকে চিনিতে পারিলেন না? আমার নাম—

ডাক্তার সেন বলিয়া উঠিলেন, "মনে পড়েচে আপনার নাম মিষ্টার চক্রবর্ত্তী।" আগন্তুক কে তাহা এতক্ষণ পরে ডাক্তার সেনের মনে পড়িল।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তীকে তিনি মিষ্টার করের বাড়ী দুইবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন ইনি জনৈক ব্রীফ্‌হীন ব্যারিষ্টার। ইহাঁর সহিত ডাক্তার সেনের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল না।

ডাক্তার সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা! আপনাকে কি আজ আমি খিদিরপুর ড'কে দেখেছিলাম? চলুন আমরা ও ঘরে বসিগে।" তাঁহারা উভয়ে পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চেয়ারে উপবেশন করিয়া মিষ্টার চক্রবর্ত্তী কহিলেন "আপনি ভুল ক'রেচেন। আমি আজ বাড়ী হইতেই বাহির হই নাই।"

ডাক্তার সেন বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বেশ মনে আছে তিনি ভদ্রলোক-টীকে আজ ড'কে দেখিয়াছিলেন।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। যা'হক আপনি কি জন্য চোরের মত খুব চুপি চুপি পলাইয়াছিলেন? এত লুকোচুরী কেন করলেন?

ডাক্তার সেন বিরক্ত হইলেন। অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে এ সব প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাই উচিত। তিনি নীরবে রহিলেন।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী পুনরায় কহিলেন, "কই আপনি আজ তাস খেলছেন না? তাস খেলা ছেড়ে দিয়েছেন না কি?" তাঁহার প্রশ্নে বিদ্রূপের স্পষ্ট আভাস লক্ষিত হইল।

ডাক্তার সেন অধিকতর বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন লোকটা কি অসভ্য! অল্প গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "না আজ রাত্রে আর তাস খেল্‌ব না।"

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। হাঁ। এ জুয়া খেলা না খেলাই ভাল। বড় বিশ্রী নেশা! আমি বে' করে তাস খেলা ছেড়েছি। আমার স্ত্রীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি যে আর কখনও তাস স্পর্শ কর্‌ব না।"

ডাক্তার সেন নীরবে রহিলেন। আগন্তুকের সহিত আলাপ শেষ হইলেই তিনি রক্ষা পান। কিন্তু চক্রবর্ত্তী সাহেব ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ডাক্তার সেন! আপনাকে আর কি বলিব! আমার স্ত্রী একটী রত্ন! আপনি বোধ হয় তাঁহাকে জানেন?"

ডাক্তার সেন ভাবিলেন, লোকটা বোধ হয় উন্মাদ। অপরিচিতের নিকট অম্লান বদনে সে তাহার পত্নীর গুণব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছে।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানেন। তাঁহার নাম মিস্ কর, মিস্ করকে আপনার মনে নাই?

ডাক্তার সেনের হস্তস্থিত চুরুট কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সহজ ভাবে কহিলেন, "বিপিন বাবুর বাড়ীর কেহ না কি?"

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। হাঁ বিপিন বাবুর একমাত্র কন্যা ললিতা।

অকস্মাৎ ডাক্তার সেনের হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি শুনিলেন মিষ্টার চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনি কি ললিতা করকে ভুলে গেছেন? কখনই নয়। কেমন বলুন, আমি কি সৌভাগ্যবান নই?"

অন্তরের দ্বন্দ্ব সবলে দমন করিয়া জড়িত কণ্ঠে ডাক্তার সেন কহিলেন, "নিশ্চয়ই। হাঁ হাঁ, আমার মনে আছে। আপনি কতদিন বিবাহ করিয়াছেন?"

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী ডাক্তার সেনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু তাহার কোন বাহ্যিক লক্ষণ না দেখাইয়া কহিলেন, "প্রায় এক বৎসর হইল। প্রথমে ললিতা কোন মতেই বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই। তবে সে সময় আমি আমার মামার একটা বিষয় পাই। তখন বিপিন বাবু ও ললিতার আর অমত রহিল না।"

চক্রবর্ত্তী সাহেবের সব কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। ডাক্তার সেন ভাবিতে লাগিলেন "এ কি সম্ভব? ললিতা বিবাহিতা—এ ও কি কখন হ'তে পারে? স্ত্রীলোকেরা এতই মিথ্যাবাদী, এত দূর অবিশ্বাসী হ'তে পারে? সে বলিয়াছিল

যে 'আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। কিন্তু এ তিন বৎসর মাত্রও সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। অর্থের মায়া কি এতই প্রবল? কথার কি কিছুই মূল্য নাই? প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী!"

রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার শিরায় শিরায় যেন আগুণ ধরিয়া গেল। তাঁহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী বলিতেছিলেন, "আমরা বিবাহের পরই ডেরাডুনে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কি সুন্দর সে স্থান! ডাক্তার সেন, আপনি যদি কখনও"—

"লোকটা কি প্যাচ প্যাচ করে বক্‌চে?" এই ভাবিয়া বিরক্ত হইয়া ডাক্তার সেন বলিয়া উঠিলেন, "আজ ওঠা যাক্, দেরি হ'য়ে গেছে!"

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। এখনও বেশী রাত হয় নাই, এখন ১১টা মাত্র। আপনি ত অবিবাহিত! আপনার এত তাড়াতাড়ি কেন? আমারও বড় তাড়াতাড়ি নাই। বিপিন বাবু ললিতাকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে গেছেন। চলুন না, ডাক্তার সেন, খানিক ক্ষণ ব্রীজ খেলা যাক্? এক দিন খেল্‌লে দোষ কি?"

এই কথায় ডাক্তার সেন হাসিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন পাছে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই আশঙ্কায় ললিতা পুরীতে পলায়ন করিয়াছে। মিথ্যা! মিথ্যা! সব মিথ্যা! এ জগৎ মিথ্যা! এ ভালবাসা মিথ্যা! আমি নির্ব্বোধ। এরূপ স্ত্রীলোককে কেন আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম?

চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "চলুন, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী! আমার আর কোন আপত্তি নাই।"

যাইতে যাইতে ডাক্তার সেনের আবার হাসি আসিল। এ কি উপহাসের কথা! ললিতার নিকট তাঁহারা উভয়েই এই সপথ করিয়াছিলেন যে আমরা আর তাস কখনও স্পর্শ করিব না। আজ উভয়েই সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া তাস খেলিতে চলিয়াছেন, অদৃষ্টের এ কি নিদারুণ পরিহাস!

রাত দুটার পর তাস খেলা ভাঙ্গিল। অনেক দিন পরে মদ্যপানে ডাক্তার সেনের নেশা চড়িয়া গিয়াছিল। টেবিলে মাথা রাখিয়া তিনি সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িলেন, চাকরেরা তাঁহাকে জাগাইতে সাহস করিল না।

অতি প্রত্যুষেই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন কতকগুলা টাকা ও নোট টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। এ কি! কাল রাত্রিতে আমি তাস খেলাতে এ গুলি জিতিয়াছি না কি?

তাঁহার তখন স্মরণ হইল তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া জুয়া খেলিয়াছেন ও মদ্য পান করিয়াছেন।

কিন্তু যাহার নিকট তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন সে যখন অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী হইল, তখন তাঁহার প্রতিজ্ঞায় তিনি আবদ্ধ থাকিবেন কেন? ললিতা যদি এক জনের হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়া বিবাহ করিতে পারে, তবে কি তিনি জুয়া খেলিতে পারেন না?

তিনি উপরে শুইবার ঘরে চলিয়া গেলেন। ট্রাঙ্ক খুলিয়া ললিতার কতকগুলি চিঠি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কেবল ললিতা প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি বিসর্জ্জন করিতে তাঁহার মন সরিল না। উৎকট মন-বেদনায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

তিনি আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। শয্যায় শুইয়া পড়িয়া তিনি পুনরায় নিদ্রিত হইলেন। ডাক্তার সেনের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যাহার জন্য তিনি বন্ধুবান্ধব ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন, যাহার মূর্ত্তি এই বিদেশে তিন বৎসর কাল তিনি সযত্নে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, যাহার সহিত মিলিত হইবার আশায় কত আগ্রহে, কত আনন্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই রমনী কি না আজ অবিশ্বাসিনী, মিথ্যাবাদিনী! "সে কি না আজ আপনাকে ভুলিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া অর্থলোভে অপরকে পতিত্বে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

জগতের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল, মানবের প্রতি তাঁহার ঘৃণা হইল। অন্তরের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য তিনি ব্যসনে ও উৎসবে গা ঢালিয়া দিলেন। মদ্য পানে তিনি কয়েক দিবস বিভোর হইয়া রহিলেন।

কিন্তু এ সব আমোদে তাঁহার আর আসক্তি ছিল না। কিছু দিন পরে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আমোদ প্রমোদ একেবারেই ত্যাগ করিলেন।

ক্রমে কলিকাতা সহর তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। হৃদয়ের জ্বালা কোন মতে হ্রাস হইল না। তিনি পুনরায় বিদেশ গমনে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন।

অচিরেই আর একটা চাকুরী মিলিয়া গেল। তিনি যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যাত্রা করিবার দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার বাল্য বন্ধু মিষ্টার ঘোষ তাঁহাকে ইভনিং পার্টিতে (Evening Party) নিমন্ত্রণ করিলেন। বন্ধুর সে নিমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

যথা সময়ে বন্ধু-গৃহে পৌঁছিয়া তিনি বহু লোকের সমাবেশ দেখিলেন। কলিকাতায় যত বিলাত ফেরত আছে সেদিন প্রায় সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেলেন। পুরুষ ও রমণীতে মিষ্টার ঘোষের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ও বৃহৎ উদ্যান পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কথাবার্ত্তা, গল্প গুজব, হাস্যপরিহাস চলিতেছিল। ডাক্তার সেন কোন মতে সে আমোদে যোগ দিলেন। তাঁহার সুমধুর সম্ভাষণে সকলকে অপ্যায়িত

করিলেন। কিন্তু বাহ্যিক আনন্দ তাঁহার বড় ভাল লাগিতেছিল না।

মানুষের সঙ্গ তাঁহার আর ভাল লাগে না। তিনি নির্জ্জন স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, উদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটা ঝোপের সম্মুখে একখানি বেঞ্চ রহিয়াছে। সেই স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। তিনি তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।

গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সে দিন ভোজনাগারে প্রভাতকালিন আহারের সময় গিলিয়ান তাহার বন্ধু মেরিয়নের একখানি পত্র পাঠ করিতেছিল। পত্রে মেরিয়ন লিখিয়াছিল "তোমরা যে প্রহসন অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে তাহাতে সে অতিমাত্র শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর এ প্রহসন অভিনয়ে আবশ্যক নাই। এক্ষণে গিলিয়ান গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুক।" দুই মাস গত হইল গিলিয়ান নর্টন হলের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে। এই দুই মাস কাল প্রত্যেক দিন সে কি উদ্দেশে নর্টন হলে আগমন করিয়াছে তাহা এলান লরসবাইকে বলিবার সঙ্কল্প করিত। কিন্তু প্রত্যেক দিনই সে সঙ্কল্প সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া পড়িত। এইরূপে দুই মাস চলিয়া গিয়াছে আজও সে এলান লরসবাইকে কিছুই বলিতে সক্ষম হয় নাই। এখানে কিন্তু ইতিমধ্যে এলান লরসবাই ও গিলিয়ানের মধ্যে বেশ একটি প্রীতিময় বন্ধুত্বের ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। অদ্য মেরিয়নের পত্র পাঠ করিয়া সে বুঝিতে পারিল যে আজ তাহাদের প্রহসন অভিনয়ের শেষ যবনিকা পাতের সময় আসিয়াছে। আজ সে নিশ্চয়ই এলান লরসবাইকে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য ও সে কে এই সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবে, এবং তাঁহার ন্যায্য উত্তরাধিকারিত্বের অধিকার গ্রহণ করিতে তাঁহাকে সম্মত করাইবে। তাহা হইলে এলান লরসবাই তাঁহার নর্টন হলের জমীদারি একটা জেলার মধ্যে পরিগণিত করিতে সক্ষম হইবেন এবং তাঁহার দীর্ঘকালের সংগ্রাম ও নিরাশা সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে।

যখন গিলিয়ান তাহার বন্ধু মেরিয়ানের পত্র পাঠে ও এলান লরসবাইকে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবার সঙ্কল্প গঠনে প্রবৃত্ত ছিল, সেই সময় এলান লরসবাই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা বলিলেন—

"কেন তোমার এ দীর্ঘ নিশ্বাস ?" গিলি-

য়ান তাহার উত্তরে বলিল আমি আপনার কথাই ভাবিতেছি। আমি আপনাকে কোন কথা বলিতে চাহি। গিলিয়ানের এই কথায় এলান লরসবাইয়ের মুখ একটি কোমল মৃদু হাস্যে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আমার মালি জেমসকে! বাগানের মাটি তৈয়ার করিবার আজ্ঞা দিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি। তাহার পর আপনার সমস্ত কথা শ্রবণ করিব।

এই বলিয়া তিনি জানালা খুলিয়া তাঁহার বাগানের দিকে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

জন্ম ও মৃত্যু তত্ত্ব।

ভৌতিক জগৎ।

ভৌতিক জগতে এক জাতীয় জীব হইতে অপর জাতীয় জীবেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে, কারণ সমগুণ কর্ম্ম প্রভাব সমান শক্তিকে আশ্রয় করে। মনুষ্য দেহে বহুরূপধারী নানা জীবের আবাস ভূমি। কোনটী উদ্ভিজ্জ, কোনটী পাশব, কোনটী কীট, পতঙ্গ বা পক্ষী সম্বন্ধীয়, আমরা জীবিতাবস্থায় ভাব ও প্রকৃতি দ্বারা সেই সকল উপলব্ধি করিতে পারি। মনুষ্য দেহের অবসানে যে জীবের যে লোকে যেমন ভাবে দেহ লাভ হউক না কেন দেহত্যাগীর ভৌতিক পরমাণু হইতেও অন্যান্য জীব সমষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা কোন কোন সদ্য শ্মশান ভূমিতে নীল বুহার নামক বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাই। উক্ত নীল বুহার শ্মশান ভিন্ন জন্মে না। মনুষ্যের শুক্র মাংস বা কোনরূপ ধাতুর বীজাণু হইতে উহার উৎপত্তি হয়। ঐ বৃক্ষের পুষ্প নীল, পত্রও নীল। তন্ত্র শাস্ত্রের মতে উহার গুণও আবার মনুষ্যের সন্তান উৎপাদক। যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না, অথবা যে সকল পুরুষের বীর্য্যে কীটাণু সকল নষ্ট হইয়া উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়াছে, বন্ধ্যা স্ত্রী ঐ বৃক্ষের পুষ্প-রস ঋতুকালে স্তন্য দুগ্ধ সহ সেবন করিলে বীর সন্তানের উৎপাদন হইয়া থাকে। কোন কোন কীট মরিয়া বৃক্ষ হয়, সে বৃক্ষের অপর কোন বীজ বা পুষ্প হয় না। ঐ সকল কীটপুষ্পের পক্ষে যেমন অপকারক, উহার বীজ হইতে; যে বৃক্ষ উৎপাদন হয় উহার গুণও আবার দেহের পক্ষে তেমন পরিপাক জনক।

এই প্রকারে উদ্ভিজ্জ হইতে কীটের ও কীট হইতে উদ্ভিজ্জ দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার নানা ভাবময় ভৌতিক জগতে এক স্থানেই বিষ ও অমৃত দেবতা ও রাক্ষস, স্বর্ণ ও লৌহ, হিরক ও কয়লা, মানব ও পশুপক্ষ্যাদির উৎপাদন হইয়া থাকে। যে গব্য দুগ্ধ দ্বারা তুমি

পুষ্ট হও ও যাহা তোমার পক্ষে পরম রসায়ণ ও সার বলিয়া তোমার বিশ্বাস সেই গব্য দুগ্ধ কোন তুচ্ছ শুষ্ক তৃণের সংযোগে কোথায় গিয়া কি ভাবে তোমার নিকট উপস্থিত হয় তাহা কে জানে। সুতরাং জাগতিক রাসায়নিক ক্রিয়া বা সৃষ্টিকার্য্যই নিরন্তর অসীম ক্ষমতা বা কৌশলের অধীন। তোমার মনুষ্য জ্ঞানে তাহার ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা অতি সামান্য মাত্র। আমাদিগের হিন্দু কেমিষ্ট্রী বা রসায়নিক শাস্ত্রে বৃক্ষের রসে স্বর্ণ প্রস্তুত হয়। পাথুরিয়া কয়লা হইতে হিরক প্রস্তুত হয়। একই মৃত্তিকার একই স্থানে একরূপ রসের অধীন তিক্ত, কটু, মধুর নানা গুণাশ্রিত নানা রসের উৎপত্তি হইতেছে। এক মানবী যোনিতে এক প্রকার শুক্র শোণিতের অধীন ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, চোর, দস্যু, দরিদ্র ও রাজা বা রাজ চক্রবর্ত্তীর জন্ম হইতেছে। দেহস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ এক দেহে একই স্থানে থাকিয়া কাহারও প্রকৃতি বিশেষে সুস্থ জীবনের কারণ, কাহারও বা রোগ, শোক, বিকার বা বিধ্বংশের হেতু হইয়া আছে। সুতরাং অজেয় প্রকৃতি ঋতু, পক্ষ্যাদিযুক্ত কালের অধীন এইরূপ ভাব গুণ সংযুক্ত জীবান্তরের সৃষ্টি করিতেছে। মনুষ্য সেই অজেয় প্রকৃতির মূল স্বরূপ কালকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে কদাচ ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না। এই সর্ব্বময় প্রত্যক্ষ ভৌতিক জগৎ একমাত্র বিশাল কার্য্য কারণের অধীন। সেই কার্য্য কারণ একটি অতি মহান্ ও অদৃশ্য সূক্ষ্ম শক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিত্য নিয়মিত সৃষ্টি, সংহার ও পরিবর্ত্তনের পথে ধাবিত হইতেছে।

সর্ব্ব শক্তিমান সকলের আধার পরমাত্মা উহার মূল বিষয়। আমরা সেই সর্ব্বগত অদৃশ্য মঙ্গলময় পরম সহায়কে জ্ঞান দ্বারা অনুভব ব্যতিত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। আমাদিগের এই ভূতাশ্রিত বাহিক ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। অন্তর্জ্জগতের অন্তর্শক্তি ব্যতীত বাহ্য জগতের প্রবল শক্তির পরিচালন হইতে পারে না। যেমন যন্ত্র কার্য্য পরিচালনের জন্য যেমন জল ও অগ্নির সহযোগে অশ্ববাষ্পের আবশ্যক করে, সেইরূপ বাহ্য জগৎ পরিচালানার্থ আভ্যন্তরিক অনন্ত ঐশি শক্তির আবশ্যক। বাহ্য অপেক্ষা অন্তর্জ্জগৎ আরও বিস্তৃত। বাহ্যভূতের মধ্যে পৃথ্বিভূতই সর্ব্ব নিম্ন ও সর্ব্বব্যাপক। পৃথ্বিভূতাপেক্ষা ক্রমশঃ জলাদিভূত এক এক গুণাশ্রয়হীন এবং ব্যাপকতায় তিন তিন গুণ করিয়া অধিক। মন সর্ব্ব উপরি এবং সকল ভূতকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই মনই দার্শনিকদিগের মতে বাহ্য জগত সৃষ্টির কারণ বলিয়া কথিত হয়। এই মনের নেতা জীবাত্মা। জীব কর্ম্ম বশে মনে লিপ্ত হইয়া ভূতপক্ষে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু নির্লিপ্ত পরমাত্মা বিনা জীবাত্মার কোন শক্তিই কার্য্যকারী হয় না। জীব ব্যবচ্ছেদীয় মনের সহকারে ইন্দ্রিয় বিকারে

লিপ্ত হইয়া শব্দাদি বিষয় সৃষ্টি ও উপভোগ করে, পরমাত্মা অবস্থাদির শক্তি লইয়া নিশ্চল ও নির্লিপ্ত ভাবে তাহাতে অবস্থিতি করেন।

নূতন সংবাদ।

১। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে এবার কংগ্রেসের সময় পার্লেমেণ্টের সদস্য মিঃ ফিলিপ মরেল ও মিঃ জোসেফ কারাচিতে উপস্থিত থাকিয়া কংগ্রেসে যোগ দিবেন।

২। আগামী ২৬,২৭ ও ২৮শে এই তিন দিন করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়কে ডাক্তার অব লিটারেচার ও ফিলজফী উপাধি প্রদত্ত হইবে। রবি বাবু পাইবেন ডাক্তার অব লিটারেচার, রাসবিহারী বাবু পাইবেন ডাক্তার অব ফিলজফী।

৪। সম্প্রতি ফরাসী দেশে ম্যাডাম ডুগানিয়া নাম্নী এক ফরাসী মহিলার উদ্যোগে এক দল মহিলা পল্টন প্রস্তুত করিবার আয়োজন হইতেছে।

৫। বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদিগের পরামর্শদাতা মিঃ আর্ণল্ডের সহকারীর কার্য্যে ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র নির্ম্মল চন্দ্র সেন নিযুক্ত হইয়াছেন।

৬। আমেরিকার সিকাগো নগরে অনেক স্ত্রীলোক পোষাক পরিচ্ছদের নিমিত্ত বৎসরে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। একশত ধনী মহিলা পরিচ্ছদের জন্য বৎসরে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় করেন। দশ হাজারের ও অধিক স্ত্রীলোকের প্রত্যেকের বার্ষিক পরিচ্ছদের ব্যয় ১৫ হাজার টাকা। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে আমেরিকার স্ত্রীলোকগণ পোষাকের জন্য কি অপরিমিত অর্থ অপব্যয় করেন।

৭। সম্প্রতি আমেরিকায় একটা ষাঁড় বিক্রীত হইয়াছে উহার মূল্য ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এই ষাঁড়টা নাকি জগতের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহার নাম পেপারমো।

৮। অনেক বিখ্যাত ডাক্তারের মত এই যে দন্তের পীড়া হইতে নাকি ক্রমশঃ চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৯। সম্প্রতি ফরাসী রাজ্যে এক নূতন আইন প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। এই আইন প্রচলিত হইলে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীর কোন ডাক্তার দরিদ্র শ্রম জীবীদিগের নিকট হইতে একদিনের জন্য ১।০ এক টাকা চারি আনার অধিক দর্শনী লইতে পারিবেন না। বিশেষ বিশেষ শ্রমজীবী সভার সদস্যগণ পীড়িত হইলেও ডাক্তার-

দিগকে এই দর্শনীতেই রোগ পরীক্ষা ও চিকিৎসা করিতে হইবে।

১০। দিল্লীতে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্ত মিউনিসিপ্যালিটী সুবৃহৎ জলাধার নির্ম্মাণ করিয়া বালুকা ও বাষ্পীয় যন্ত্রাদির সাহায্যে বিশুদ্ধ জল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বামারচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

সাজায়ে আজিকে শিশির চন্দনে
আনিনু "দ্বিতীয়া" ডালি।
সারা বরষের মঙ্গল বাসনা
হরষে দিব যে ঢালি।
সুখের হিল্লোল হৃদয় মাঝারে
তুমি গো বহায়ে দিলে।
নব আশা কত উদিছে আজিকে
সব দুঃখ ব্যথা ভুলে॥
তোমার আশায় রহি অপেখিয়া
সুদীর্ঘ বরষ ধরি।
পূজিবে আজিকে কতই আগ্রহে
ভগিনী পরাণ ভরি॥
তাই—আদরে তোমারে বরিতে এসেছি
নিরমল প্রীতি সাথে।
পুণ্য "দ্বিতীয়া" তুমি হে ধন্ত
দাও শুভাশীষ মাথে॥

সুনীতি ভাদুড়ী—
কেশবধাম
বেনারস সিটি।

তন্ময়।

(১)

বিভো! নাহি বা রহিল আপন ধরায়
তুষিতে যতনে প্রাণ,
নাহি বা লভিনু স্নেহাদর দয়া
বিভব সুযশঃ মান।
নাহি বা রহিল হাস্ত কলরোলে
মুখরিতে দীন গেহ,
তা বলিয়া নাথ! তব করুণায়
রহে কি বঞ্চিত কেহ?

(২)

বিশ্ব মহা যোগে প্রদানি আহুতি
সার ধন আপনার,
আজি হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে
রাজ তুমি প্রেমাধার।
একা অসহায় অনাথ ভাবিয়ে
কাঁদি নাক আর ভয়ে,
তোমাতে বিশ্বাস নির্ভর যাহার
সে যে গো! অশনি সহে!

(৩)

গোধূলি উষায় খুলিয়া হৃদয়
বিহগ কাকলী সনে,
তব নাম গান করি নীতি দেব।
পুলকে আপন মনে।
প্রীতি ফুল্ল মুখে সাধি নিজ কাজ
বিকচ কুসুম সম,
দিবা শেষে নীতি তব পদে ঢলি
পড়ে গো হৃদয় মম।

(৪)

মোহ ছলে কভু হারাইয়ে তোমা
গভীর আবেগ প্রাণে;
বিরহ কাতর তরঙ্গিনী প্রায়
ছুটে চলি তব পানে।
তব দয়া প্রেম মমতা আদর
ক'রেছে পাগল মোরে,
যদিও বেঁধেছে কঠিন নিগড়ে
বাঁধ প্রভো! চিরতরে।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।
চট্টগ্রাম।

কি চাই?

(১)

আমি চাই শুধু, একখানি প্রাণ,
করুণা পুরিত তায়।
সংসারের শত, প্রলোভন মাঝে,
সে চিত কভু না ধায়॥

(২)

সম্পদে বিপদে, না হয় অধীর,
সমান উভয় জ্ঞান।
পরের বেদনা, নিরখি যেন গো,
সতত কাঁদে সে প্রাণ॥

(৩)

বিপন্ন যে জন, উদ্ধারিতে তারে,
স'পিতে পারি গো প্রাণ।
এই মম আশ, পূর্ণ কর প্রভু,
নাহিক বাসনা আন॥

(৪)

হিংসা দ্বেষ ভুলি, পর উপকারে,
সতত মানস রয়।
হোক মহা শত্রু, পড়িলে বিপদে,
বিভেদ জ্ঞান না হয়॥

(৫)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ফল আদি,
কিছুই চাহি না আর।
যেন পর হিতে, পারি গো স'পিতে,
এ ক্ষুদ্র জীবন ভার॥

(৬)

আর যেন প্রভু, দিনান্তে তোমায়,
বারেক ডাকিতে পাই।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ, ধরম করম,
কিছুই প্রার্থনা নাই॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ
বারুইপুর খুলনা

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 604. December, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৪ সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ, ১৩২০। ডিসেম্বর, ১৯১৩	১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

পণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঝোপের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঝোপের অপর পার্শ্ব হইতে কণ্ঠধ্বনি শুনিলেন, "কিছু খান না, এই গরমে আপনার তৃষ্ণা পায় নাই? কিছু মনে করবেন না, আমি বড় তৃষিত, সরবৎ পান করিয়া এখনি আসিতেছি।"

কি সর্ব্বনাশ! এ যে মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠস্বর! তিনি এখানে কেন?

পরক্ষণেই উত্তর হইল, "আপনি যান, আমি এখানে অপেক্ষা করিব।"

সহসা ডাক্তার সেনের রক্তস্রোত বন্ধ হইল, নিশ্বাস প্রশ্বাস থামিয়া গেল। এ স্বর ত ভুলিবার নয়—এ কণ্ঠ, এ বাণী এখনও তাঁহার অন্তরে প্রতি নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। এ যে অবিশ্বাসিনী ললিতার কণ্ঠস্বর।

তিনি বুঝিলেন মিষ্টার চক্রবর্ত্তী তাঁহার পত্নীর সহিত নির্জ্জনে গল্প করিতেছিলেন। ললিতার প্রতি তাঁহার আর মমতা রহিল না। তাহার প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্য, তাহার বীণা-নিন্দিত কণ্ঠস্বর মিথ্যা চাতুরীতে পূর্ণ। সে এখন পরস্ত্রী, ডাক্তার সেনের মন-ভাব কঠিন হইল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই চক্রবর্ত্তী সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। আপনি সরবৎ খান নাই বেশ করেছেন। বড় মিষ্ট। আপনার ভাল লাগিত না। আচ্ছা! প্রবোধের কাছে ঐ যে মেয়েটী দাঁড়িয়ে আছে? ওকে অপরিচিত বলে মনে হ'চ্ছে।

ললিতা। হাঁ। উনি মিষ্টার বসুর কন্যা। ওঁরা দার্জ্জিলিংএ থাকেন। সম্প্রতি এখানে এসেছেন।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। বটে! সে দিন ক্লাবে আপনার একজন পুরাতন বন্ধুর

সহিত দেখা হ'ল। তিনি সম্প্রতি সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছেন।

ললিতা। আমার বন্ধু।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। হাঁ, মনে নাই কি? ডাক্তার সেন, আপনাদের এখানেত প্রায়ই আস্‌তেন। বেচারার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে? আমি ত তাঁ'কে প্রথমে চিন্‌তেই পারি নাই। মদ খেয়ে খেয়ে তাঁর শরীর জীর্ণ হয়েছে। শুনিলাম তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করেছিলেন কিন্তু জুয়া খেলে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। এখানে যখন ছিলেন, তখন তিনি এতদূর অধঃপাতে যান নাই।

রমনী কোন উত্তর করিল না। অল্পক্ষণ থামিয়া মিষ্টার চক্রবর্ত্তী ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "আপনাকে এত বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন? ডাক্তার সেনের কাহিনী শুনে আপনার কষ্ট হল না কি? এমন জান্‌লে আমি বল্‌তাম না। কিন্তু তিনি আপনার সহানুভূতির যোগ্য নন। তাঁর মতন লম্পট মাতাল বড় দেখা যায় না। তাঁ'কে ভুলে যান।"

তৎপরে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে অনুচ্চ স্বরে মিষ্টার চক্রবর্ত্তী ধীরে ধীরে কহিলেন, "কিন্তু আমি কি আপনার স্নেহের যোগ্য নই? আপনি কি এতই নির্দ্দয়? আপনার স্নেহকনা কি আমি পাব না, মিস্ রায়? এই এক বৎসর ধরে আপনার আশাতেই আমি বেঁচে আছি।"

এ কি! ডাক্তার সেন স্তম্ভিত হইলেন। মিস্ রায়! এ কি সম্বোধন? কেনই বা মিষ্টার চক্রবর্ত্তী ললিতার সহিত "আপনি" "আপনি" বলিয়া কথা কহিতেছেন? তাঁহার অন্তরে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। আবেগে তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল। তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময় ললিতা স্থির অবিকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "মিষ্টার চক্রবর্ত্তী! কেন আবার আপনি এ সব কথার উত্থাপন করিতেছেন? আপনাকে ত আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে আমি আপনাকে কখনও বিবাহ করিতে পারিব না।"

হস্ত প্রসারিত করিয়া মনের উদ্বেগে মিষ্টার চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিলেন, "কখনও না"—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না। আপনি কি জানেন না আমি আপনাকে কত ভাল বাসি!

দিন দিন আপনার প্রতি আমার প্রেম গভীরতর হইতেছে। এ জগতে বোধ হয় আমার মত কেহ—"

কথা আর সমাপ্ত করা হইল না। ডাক্তার সেন এত অধীর হইলেন যে তিনি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর সম্মুখীন হইলেন।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী অবাক্ হইয়া কুণ্ঠিত ভাবে কহিলেন, "ডাক্তার, সেন যে!"

ডাক্তার সেন বজ্রগম্ভীর অথচ অনুচ্চ স্বরে কহিলেন, "হাঁ—ডাক্তার সেন! তোমার বর্ণিত লম্পট, মাতাল, নেশাখোর, পশু ডাক্তার সেন নহে—চেয়ে দেখ, এ জীবন্ত সচেতন পুরুষ। আমার এত শক্তি আছে যে তোমাকে পিসিয়া ফেলিতে পারি।

প্রবঞ্চক! মিথ্যাবাদী! তোমাকে আমি আজ উপযুক্ত শিক্ষা দিব।"

ভীতা কম্পিতা ললিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার সেনের সম্মুখীন হইয়া কহিল, "না, না" আপনারা মারামারি করিবেন না।"

পশ্চাৎ সরিয়া গিয়া ডাক্তার সেন বলিলেন, "মাপ করিবেন, মিস্ রায়! কিন্তু দেখুন এই প্রবঞ্চকের ব্যবহার দেখুন। আমি যে দিন কলিকাতায় ফিরিয়া আসি সে দিন এই লোকটা ক্লাবে গিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে আমার কাছে বলিয়াছিল যে আপনি তাঁহার বিবাহিত পত্নী। এমন কি, বিবাহের পর আপনারা ডেরাদুনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, এই মিথ্যাবাদী এত দূর মিথ্যা কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। আজ আবার আপনার নিকট আমার অযথা নিন্দা করিতেছে। এ শঠের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

ললিতা স্থির দৃষ্টিতে একবার মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর প্রতি অবলোকন করিল। দেখিল, তিনি ভীত হইয়া ক্ষুব্ধ:চিত্তে অবনত:মস্তকে বসিয়া আছেন। রমণী তৎপরে ডাক্তার সেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "যাক! যাহা হইবার হইয়াছে, আপনি ওঁকে আর কিছু বলিবেন না।"

ডাক্তার সেন। আপনার অনুরোধে এ মিথ্যাবাদিকে আজ অব্যাহতি দিলাম।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী এবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কপট হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আমার সকল আশা শেষ হইল। শুনুন, ডাক্তার সেন! আমি মিথ্যাবাদী সন্দেহ নাই। কিন্তু মিস্ রায়কে লাভ করিবার আশাতেই আমি মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিলাম। আপনি যদি মিস্ রায়ের আশা ত্যাগ করেন এই ভরসাতেই আমি ক্লাবে গিয়া আপনার নিকট মিস্ রায়ের বিবাহের কথা বলিয়াছিলাম। আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে আমি খিদিরপুর ডকেও গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সব চেষ্টা আজ বিফল হ'ল। বিদায়।"

এই বলিয়া মিষ্টার চক্রবর্ত্তী সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে পর ডাক্তার সেন কহিলেন, "ললিতা! তুমি যদি বারণ না করিতে তবে এ নীচ মিথ্যাবাদিকে আজ আমি হত্যা করিতাম।"

ললিতা! তবু তুমি ভেবেছিলে যে এরই জন্য আমি তোমাকে ভুলে গেছি, ও তোমার কাছে অবিশ্বাসিনী হইয়াছি।

ডাক্তার সেন। এ লোকটা এমন নিঃসঙ্কোচে মিথ্যা বলিয়াছিল যে আমি প্রতারিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সে দিন তোমার কাছে না আসাতে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অবিশ্বাসী ভেবেছিলে। কেমন?

ললিতা গ্রীবা আন্দোলন করিয়া কহিল, "না! আমি ভেবেছিলাম যে তোমার কোন বিপদ হ'য়েছে। সেই জন্য তুমি আসিতে পার নাই। তাঁহার চিন্তাতেই যে ললিতার দেহ শুখাইয়া গিয়াছে এ

কথা বুঝিতে ডাক্তার সেনের বিলম্ব হইল না। তিনি পুনরায় কহিলেন, "কিন্তু চক্রবর্ত্তী যখন আমার নিন্দা করিতেছিল, তুমি নিশ্চয়ই তা'কে বিশ্বাস করেছিলে ?"

ললিতা। হাঁ! অতীতের কথা মনে ক'রে আমি কতকটা বিশ্বাস করেছিলাম।

ডাক্তার সেন। আমার নিন্দা শুনে আমার প্রতি তোমার ঘৃণা হয়েছিল ?"

ললিতা। না।

ডাক্তার সেন। না ?

বিস্মিত হইয়া ডাক্তার সেন তাঁহার চিরবিশ্বস্ত প্রণয় প্রতিমাকে প্রেম পূর্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন।

ললিতা অস্ফুটস্বরে কহিল, বিদায়ের দিনের আমার শেষ কথা তোমার মনে আছে ?"

ডাক্তার সেন। বল কি ললিতা ? সে কথা এখনও আমার কানে ধ্বনিত হচ্চে।

ললিতা। কি ? বল দেখি।

ডাক্তার সেন। 'আমি তোমার জন্ত অপেক্ষা করিব।'

ললিতা। হাঁ। তিন বৎসর নয়, পাঁচ বৎসর নয়, আমি চিরকাল তোমার জন্ত অপেক্ষা করিতাম। চক্রবর্ত্তীর কথা শুনে আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ভুলে গেছ। কিন্তু তবু তোমার প্রতি আমার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ ছিল। রমনীর প্রেম যে কত গভীর তাহা পুরুষে বুঝিতে পারে না।

ডাক্তার সেন। ললিতা! প্রিয়তমে! পুরুষেরাও ভালবাস্তে জানে ? দেখ, চক্রবর্ত্তী যখন তোমার বিবাহের কথা বলিল, তখন আমি পাগলের মত হ'য়ে পড়েছিলাম। তোমার চিঠিগুলি ছিঁড়ে ফেল্লুম তোমার ফটো খানা পুড়াইলাম। কিন্তু তবু তোমাকে ভুলিতে পারিলাম না। আমি পুনরায় বিদেশ গমনে কৃত সংকল্প হয়েছি। কিন্তু তবু তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। তোমার প্রদত্ত আংটিটা ফেলে দিতে পারি নাই। কেমন বল পুরুষেরা ভালবাস্তে জানে কি না ?"

ললিতা সে কথার আর উত্তর করিল না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।
ছাপরা।

ভাগ্যবতী রমণী কে ?

এই সংসারে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহে, কেহই দুরবস্থায় থাকিতে চাহে না। কিন্তু সকলেই সর্ব্ব প্রকার সৌভাগ্যের অধিকারী হয় না। এক এক জন এক এক প্রকার সৌভাগ্য করে, আবার হয়ত অপরবিধ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। অশিক্ষিত ও নীচমনা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে

প্রায়ই দেখা যায়, যে তাহারা কোন এক প্রকার সৌভাগ্যের অধিকারিনী হইয়া অন্যকে তদভাবে ঘৃণা করে। এই কারণেই সুরূপা কুরূপাকে, অলঙ্কারযুক্তা অনলঙ্কৃতাকে, ধনীর স্ত্রী দরিদ্রের স্ত্রীকে এবং বিদুষী মূর্খাকে ঘৃণার সহিত দেখে। মনের প্রকৃতিই অহঙ্কার, এই জন্য ঈশ্বর কাহাকেও সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।

কোন কোন নারী সৌভাগ্যবতী বলিয়া অহঙ্কৃতা নহেন, কিন্তু তাঁহারা অপর স্ত্রীলোকদিগকে ভাগ্যশীলা ভাবিয়া, নিজের দুরাবস্থার সহিত তাহাদের ভাল অবস্থার তুলনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠার ন্যায় অন্যের সম্পদে শুকাইয়া যাওয়াও ভাল নয়। কোন এক পণ্ডিত বলিয়াছেন "যদি নিজকে বড় বলিয়া মনে কর, তবে আরও বড়র দিকে দৃষ্টিপাত করিও, আর যদি নিজকে ছোট বলিয়া মনে কর তবে আরও ছোটরদিকে দৃষ্টিপাত করিও।" আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে ভাবিলে যদি দেখা যায় যে আমা অপেক্ষা আরও ভাগ্যবতী আছে, তবে আর নিজকে বড় বলিয়া অহঙ্কার আসিতে পারে না। পক্ষান্তরে নিজকে দুরবস্থাপন্না বলিয়া বোধ করিলে যদি দেখা যায় যে আমা অপেক্ষা অধিকতর হীনাবস্থায় কেহ আছে, তাহা হইলে নিজকে ছোট ভাবিয়া মনে যে কষ্ট হয়, তাহা আর আসিতে পারে না।

সুখী কে? এই বিষয়ের উত্তরস্থলে নানাস্থানে নানাভাবে সুখের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে লিখিত আছে "ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের মূল আরোগ্য।" অতএব আরোগ্য বা ব্যাধিহীনতাই সুখ। কোন মহিলা যদি নিজকে এবং পতি পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় সকলকে সুস্থদেহ দেখেন তাহা হইলে তিনি সুখে আছেন, ইহা ভাবুন বা না ভাবুন, বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে তিনি তখন সুখের অধিকারিণী। শারীরিক সুস্থতা যে সর্ব্ব সৌভাগ্যের নিদান ইহা কি আর বলিতে হয়? কোন আত্মীয় বা পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনি ভাল আছেন ত?" ইহার অর্থ এইরূপ "যে শারীরিক সুস্থতা সর্ব্বসৌভাগ্যের মূল, আপনি সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত নহেন ত?"

কিন্তু একটী কথা আছে "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং" শরীর থাকিলেই ব্যাধি আছে। অজ্ঞানতা, অনভ্যাস বা অমনোযোগ বশতঃ অনেকগুলি স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা রোগগ্রস্ত হই। জল বায়ুর দোষে এবং সংক্রামক রূপেও আমরা অনেক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হই। সুতরাং পীড়া মনুষ্যের অনিবার্য্য। সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া গতায়ু হইয়াছেন, এরূপ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত খুব কম শুনিতে পাওয়া যায়।

আমাদের শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে আছে, যাঁহার প্রবাস দুঃখ নাই তিনিই সুখী। এরূপ সুখী গৃহস্থ বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে অতি বিরল। অনেক বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থই জীবলোকের সুখকরী অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধনার্জ্জনের জন্য প্রবাসে থাকেন। যে রমণী পতি পুত্র সহ একস্থানে থাকেন, সুতরাং স্থানান্তরে বাসজনিত অদর্শনের কষ্টে ব্যথিতা না হন তিনিই ভাগ্যবতী। বিদেশে বাস না করিয়া আত্মীয়গণ সহ একত্রাবস্থান করা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

যিনি ধনবান্ গৃহস্থের পত্নী বা নিজে ধনবতী এবং যখন যাহা অভিলাষ করেন, তখনই তাহা লাভ করিয়া মনের সাধ মিটাইতে পারেন, তিনিই ভাগ্যবতী। সকল গৃহস্থের ধনবান্ হওয়া অসম্ভব। যে গৃহস্থ ঋণ শূন্য তিনিও সুখী। অল্প অল্প সঞ্চয়ও সময়ে অনেক উপকারে আইসে। ঋণ দায় অপেক্ষা কষ্টের বিষয় এবং সঞ্চয়শীলতা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর নাই। গৃহিণী যদি মিতব্যয়শীলা হন তবে অনেক স্থলে দেখা যায় যে স্বামীর ঋণদায় ঘটে না এবং অবস্থানুসারে অল্লাধিক সঞ্চয়ও হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রে অমিতব্যয়শীলা গৃহিণী নিন্দনীয়া বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকে। অর্থের উপার্জ্জন অপেক্ষা রক্ষণ, ব্যয় ও সঞ্চয়েই অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন। যে পরিবারে গৃহস্থ অর্থোপার্জ্জন করিয়া গৃহিণীর হস্তে দেন এবং গৃহিণী ধর্ম্মোদ্দেশে, বিলাসিতায় এবং বিবিধ সাংসারিক ব্যয়ে অবস্থানুসারে মিতব্যয় করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন, তিনি বুদ্ধিমতী সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান দুরবস্থার দিনে সকল গৃহস্থের অবস্থানুসারে সঞ্চয় অসম্ভব হইলেও অন্ততঃ উপার্জ্জিত অর্থে বুঝিয়া চলিলে এবং ঋণ করিতে না হইলেই সে গৃহস্থকে সুখী বলা যাইতে পারে। কারণ ঋণদায় সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাগ্যের এবং সঞ্চয়শীলতা সকল সৌভাগ্যের নিদান।

যে রমনীর পুত্র পণ্ডিত, তিনি সৌভাগ্যবতী, এ বিষয়ে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বপণ্ডিতের একই অভিমত। আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলেন "বহুপুত্র ইচ্ছা করিবে। শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে বা এরূপ ও আছে যে "গুণবান্ এক পুত্রও ভাল।" শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে বা এরূপও আছে যে পুত্র না হওয়াও ভাল, কিন্তু মূর্খ পুত্র মাতা পিতার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর। শাস্ত্রের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উক্তিতে বোধ হয় যে পুত্রলাভ সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু পুত্রগণ যাহাতে শিক্ষিত হন, মাতা পিতা তদনুরূপ চেষ্টা করিবেন। পুত্র জন্মের পর অনেক প্রসূতি রোগাক্রান্ত হন, পুত্রের অকাল মৃত্যুতে মাতা পিতা অপরিসীম শোকাভিভূত হন, বহু পুত্র থাকিলে পুত্রদের মধ্যে কাহারও না কাহার পীড়া লাগিয়াই থাকে, অনেক পুত্রের মধ্যে সকলকেই সাধু ও বিদ্বান্ হইতে দেখা যায় না। এই সকল মনে

করিয়া বন্ধ্যানারীগণ পুত্র না হওয়ার কষ্ট দূর করিবেন। যে সকল স্ত্রীলোকের পুত্র বিদ্বান্‌, ধাৰ্ম্মিক, অরুগ্ন, পিতৃভক্ত সেই সকল পুত্রবতী নারী সৌভাগ্যবতী তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃত বিদুষী রমণী সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যের ভাজন,তাহাতেও সন্দেহ নাই। নিজে বিদ্যাবতী হইলে তিনি পুত্র কন্যা-দিগের সুশিক্ষা বিধানে বিশেষ মনোযোগী হইয়া থাকেন। বিদুষী রমনীগণ যাহাতে পিতৃ কুলের ও শ্বশুর কুলের গৌরব রক্ষা হয়, এবং কোন প্রকারে লোক সমাজে নিন্দনীয়া না হন, এইরূপ অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন, কাজেই দুরাশার অসীম যন্ত্রণা ভোগ করেন না। তাঁহারা হর্ষে ও শোকে একেবারে মোহিতা হইয়া পড়েন না, সকল অবস্থাতেই তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতা একই প্রকার থাকে। বাক্য, মন ও কার্য্যে তাঁহাদের অকপট ও সরল ব্যবহার দেখিয়া সকলেই তাঁহাদের বাধ্য হয়। ধর্ম্ম চিন্তা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সৎগ্রন্থপাঠ সাধু চরিত্রাদিগের সহিত সদ্ভাব প্রভৃতিতে তাঁহাদের মন দেবীর ন্যায় সদ্ভাবাপন্ন হয়। তাঁহারা অনর্থক কোন কার্য্যারম্ভ করেন না, অনর্থক কোন বাক্যব্যয় ও ধনব্যয় করেন না এবং অনর্থক সময়ক্ষেপ করেন না। তাঁহাদের মুখ প্রসন্ন, দৃষ্টি কুটীলতা বর্জ্জিতা, আলাপ মধুর, ব্যবহার অহঙ্কার শূন্য। তাঁহারা দিবা রাত্রির মধ্যে সময় বিভাগ করিয়া যখনকার যে কাজ তাহা তখন সম্পন্ন না করিয়া নিশ্চিন্ত হন না। তাঁহারা প্রতিদিন আত্ম পরীক্ষা করিয়া চরিত্রকে ক্রমশঃ দেবভাবাপন্ন করেন। এইরূপ বিদ্যাবতী ও চরিত্রবতী নারী প্রকৃত ভাগ্যশীলা সন্দেহ নাই।

বাসস্থানের দোষগুণ অনুসারে অনেক স্থলে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লাভ করিতে হয়। যদি এরূপ স্থানে বাস করা যায় যে তথায় উত্তম চিকিৎসক নাই, স্রোতস্বতী বা উত্তম জলাশয় নাই, তথায় উৎকট পীড়া হইলে নিরু-পায় হইতে হয়,এবং দূষিত জলে স্নানও তাহা পানাদিতে অনেক পীড়ার সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন গ্রাম ব্যাঘ্র শূকারাদি হিংস্রজন্তু সমাকুল অরণ্যপূর্ণ বলিয়া যেমন ভয়ানক, কুটীল ও অসৎস্বভাব মনুষ্য-সমাকুল লোকালয় বলিয়া আবার তদপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। গ্রামে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নাই, সদুপদেশদানে সমর্থ সাধু চরিত্র ধাৰ্ম্মিক নাই, অথবা বিদুষী ও ধাৰ্ম্মিকা রমনী নাই, সুখ দুঃখের সময় আলাপ করিয়া শান্তি পাওয়া যাইতে পারে এরূপ সখী বা সখা নাই, এরূপ স্থান ভদ্র পুরুষ ও রমনীগণের পক্ষে সুখ জনক নহে। যেখানে প্রতিবাসিগণের মধ্যে ঈর্ষা, ঘৃণা ও শত্রুতা আছে, পরিবারস্থ সকলের মধ্যে অহর্নিশি কলহ লাগিয়া রহিয়াছে তথায় বাস করিলে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? উল্লিখিত দোষ সকল বর্জ্জিত স্থানে বাস করিলে অনেক দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা

পাইবার সুবিধা এবং সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে।

বিরক্তিকর ও অনাবশ্যক কার্য্য সকল ত্যাগ করিয়া কোন অভিমত সাধু বিষয়ে মনোনিবেশ করা অনেক স্থলে সৌভাগ্যের কারণ হয়। বিদ্যানুশীলন, ধর্ম্মচিন্তা, অগর্হিত শিল্পবিদ্যানুশীলন ইত্যাদি সদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে তৎকালে সুখের কারণও পরিণামে সৌভাগ্যের কারণ হয়। কিন্তু যদি অনিয়মিত বিলাসিতায়, সাধু নিন্দিত কুপুস্তক পাঠে ও শরীরক্ষয়কারী দুশ্চিন্তায় অধিক মনোনিবেশ করা হয়, তবে তাহাতে ভাগ্যলক্ষ্মীর আরাধনা করা হয় না, বরং করগত সৌভাগ্যকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়। কারণ ঐরূপ মনোনিবেশকে অলসতা রোগের এক প্রকার নিদান বলা যায়। আলস্য পরায়ণা নারী কখনও ভাগ্যবতী হইতে পারে না। আলস্য ত্যাগ করিয়া যে রমনী স্বকীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে অভিনিবেশশীলা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্যলক্ষ্মীও সখীর ন্যায় আসিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গণ করে। সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম আবার গৃহস্থ বিশেষে নানা প্রকার। সেই সকলের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

অকপটাচার বা সরল ব্যবহার সৌভাগ্যদেবীর আরাধনার প্রধান উপকরণ। কি পিতৃকুলে, কি শ্বশুর কুলে, কি স্বামীর সহিত ব্যবহারে, কি সমবয়স্কা ও পরিচিতাদিগের সহিত আলাপে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার কপটতা শূন্য ব্যবহার অভ্যাস করিলে, নারীগণ স্বর্গবাসিনী দেবীর ন্যায় হৃদয়বতী হন! সৌভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্ব দিক হইতে তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করেন।

কি প্রকারে ভাগ্যবতী হইতে চেষ্টা করা যাইতে পারে, এবং তাহা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত কিনা সংক্ষেপে এই কথার উত্তর করিতে গেলে বলা যাইতে পারে "যে রমনীর সাধু ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট তিনিই ভাগ্যবতী।" সাধু ব্যবহারে পরিবারস্থ সকলের সন্তোষ জন্মাইতে হইলে প্রথমতঃ অলসতা ত্যাগ করিতে হয়। কিরূপ ব্যবহার কাহার প্রীতির কারন হয় তাহা জানিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবার বুদ্ধি ও চেষ্টা দৃঢ়তর করিতে হয়, নিজের অভ্যাসগত কোন ব্যবহার গুরুজনদিগের বিরক্তির কারণ হইতেছে তাহা জানিয়া আপনার দোষ সংশোধন করিতে হয়। কাহারও কর্কশোক্তিতে বিরক্ত না হইয়া বাক্যসংযম, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে হয়। সকল অবস্থাতেই বিষণ্ণ ভাব, বিরূপ ব্যবহার ও বিষণ্ণ মুখ ত্যাগ করিতে হয়।

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট তথায় সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য বিরাজ করে"। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে আছে যে গৃহস্থের ভার্য্যা প্রিয়া অর্থাৎ অনুকুলাচরণশীলা এবং মধুরভাষিনী সেই গৃহস্থই সুখী। পতি ও পত্নী

উভয়ের মধ্যে একের আচরণে অপর তুষ্ট হইলে এবং কর্কশ ব্যবহার ও কর্কশ বাক্য দ্বারা একে অন্যের মনঃকষ্ট না দিয়া সদয় ব্যবহার ও মধুর বাক্যে পরস্পরের প্রীতি জন্মাইতে পারলে সেই পরিবারের সৌভাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বুদ্ধিমতী মহিলার পক্ষে স্বামীর অভিমতানুবর্ত্তন দুঃসাধ্য নহে। স্বামী কিরূপ আলাপে পরিতুষ্ট হন, কিরূপ আহারে তাঁহার রুচি, কিরূপ ব্যয়ে মুক্তহস্ত ও কিরূপ ব্যয়ে মিতাচারী, কোন সময়ে প্রয়োজনানুসারে কোন কোন দ্রব্য দ্বারা কিরূপ ভাবে তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, কিরূপ বেশভূষায় সজ্জিতা দেখিলে তাঁহার আনন্দ লাভ হয়, কোন সময়ে কোন কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিলে তাঁহার অভিমতানুসারে চলা হয়, গৃহ ও গৃহোপকরণাদি কিরূপে পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খলা যুক্ত দেখিতে তিনি ভাল বাসেন, স্থানান্তর হইতে ভবনে প্রত্যাগত হইলে কিরূপ শুশ্রূষায় তাঁহার তৃপ্তি বোধ হয়, এইগুলি বুঝিয়া লইয়া তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়। পতির নিষেধ বাক্য লঙ্ঘন না করিয়া উপদিষ্ট বিষয়ের আচরণই পতিকে বশীভূত করিবার মূল মন্ত্র। যেমন করিয়া বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করিলে সমস্ত বৃক্ষেই জল দেওয়া হয়, তেমনি সমস্ত সৌভাগ্যের মূল পতির প্রসন্নতা লাভের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সমস্ত সৌভাগ্যেরই কারণ হইয়া থাকে।

কোন নবপরিণীতা দুহিতাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময় যদি মাতা তাঁহাকে একটি মাত্র এইরূপ উপদেশ দেন যে সর্ব্বপ্রকারে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ও স্বামীর মতের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিবে তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় তাঁহাকে সকল উপদেশেরই সার কথা বলিয়া দেওয়া হয়। যিনি অকপট, সরল ও অনুকূল ব্যবহার দ্বারা সকলের প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা করেন সেই রমনীই ভাগ্যবতী হইতে পারেন।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম।
কাব্যতীর্থ ও পুরাণতীর্থ।

বর-পণ।

বোধ হয় সকলেই জানেন যে যাহারা কন্যা বেচিয়া খায় তাহারা ভিন্ন সর্ব্বত্র কন্যার বিবাহ কালে কন্যাপক্ষ হইতে বরকন্যাকে যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করা হয়। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ বিবাহ মধ্যে মনুর মতে ব্রাহ্ম বিবাহই প্রশস্ত বলা হইয়াছে। সেই বিবাহ সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা

কন্যাবরের আচ্ছাদন ও পূজন পুরঃসর বিদ্যা ও সদাচারে সম্পন্ন অপ্রার্থী বরকে কন্যাদান" কার্য্য নিষ্পন্ন করাই শাস্ত্রের আদেশ। মহাভারতের যুগে রাজকুলের কন্যার বিবাহে বহুতর যৌতুক প্রদান করা হইত, এইরূপ উল্লেখ আছে। আদিপর্ব্বে দ্রৌপদীর বিবাহ কালে কথিত আছে :-"পরিণয় সম্পন্ন হইলে, দ্রুপদ রাজ পাণ্ডবদিগকে বহুবিধ ধন, পর্ব্বতের ন্যায় মহোন্নত একশত হস্তী, মহার্হ বেশভূষা বিভূষিত একশত দাসী এবং স্বর্ণালঙ্কৃত ও স্বর্ণ গ্রহোপেত অশ্ব চতুষ্টয় যোজিত একশত রথ প্রদান করিলেন। সুভদ্রা হরণ অধ্যায়ে উক্ত আছে, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া খাণ্ডব প্রস্থে গমন করিলে, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রার জন্য "কন্যা-ধন স্বরূপ" বহুতর যৌতুক লইয়া সেখানে গিয়াছিলেন। বিরাট পর্ব্বে উত্তরার বিবাহ স্থলে বর্ণিত হইয়াছে "মৎস্যরাজ বিরাট জামাতাকে প্রীতি পূর্ব্বক সপ্ত সহস্র অশ্ব, দ্বিশত হস্তী, ভূরিধন, রাজ্য, বল কোষ প্রদান করিলেন।"*

সেই পুরাতন যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে বর্ত্তমান যুগে বহুদিন হইতে এ দেশে বিবাহ কালে কন্যাকে যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কার এবং জামাতাকে বরাভরণ ও বর সজ্জা দিবার রীতি আছে। কন্যাসন্তান পিতৃ বংশে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলেও মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়দিগের একান্ত স্নেহের পাত্রী, অতএব কন্যা ও জামাতাকে এইরূপ দান করা কেবল কর্ত্তব্য সম্পন্ন নহে, ইহাতে লোকের প্রাণের আবেগ হওয়াও স্বতঃসিদ্ধ।

মানব যখন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করে, যখন প্রাণের উচ্ছ্বাসে কোনও মঙ্গলজনক কর্ম্ম করে, তখন সে কাজ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ পূর্ব্বক নিজকে সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করে। তাহাতে তাহার মনের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু মানব যদি দায়ে পড়িয়া বা বাধ্য হইয়া কোনও কার্য্য সম্পন্ন করে, তবে তাহাতে তাহার আত্মপ্রসাদ অথবা চিত্তের শান্তি লাভ দূরে থাকুক, সে নিজকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য জীব মনে করে এবং তাহার মানসিক অবনতি হইতে থাকে।

অধুনা বঙ্গদেশ হইতে কন্যাপক্ষের স্বেচ্ছা প্রদত্ত কেবল কন্যা ও জামাতার বস্ত্রালঙ্কার, বরসজ্জা প্রভৃতি দ্বারা কন্যার বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয় না। বরপণ স্বরূপ নগদ টাকা বর অথবা বরপক্ষকে প্রদান করিতে হয়। এই জন্য কোথাও দুই তিন শত, কোথাও বহু সহস্র দেওয়া হইয়া থাকে। কন্যাপক্ষ বর মনোনীত করিলে, সেই বর বা বরপক্ষ যেরূপ অর্থ দাবী করেন, কন্যাপক্ষ যদি তাহা দিতে পারেন, তাহা হইলে বিবাহ ক্রিয়া সমাধা

* মহাভারত—মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ।

হয়। এইরূপ দায়ে পড়িয়া, বা বাধ্য হইয়া বরপণ প্রদান করিতে, এ দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের আত্মপ্রসাদ ও চিত্তের শান্তি বিনষ্ট হইতেছে। অধিকন্তু অনেককে পৈতৃক সম্পত্তি, বাসভবন, এমন কি গ্রাসাচ্ছদনের সংস্থান পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইতে হইতেছে। এই কার্য্যের পরিণাম আরও যে কি বিষময় হইবে, তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে!

ভারতীয় হিন্দু সমাজে কন্যার বিবাহ দেওয়া লোকের অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে চলিয়া আসিতেছে। বিবাহ যোগ্য কন্যার বিবাহ না হইলে, ধনী ব্যক্তিদিগকে সমাজ কিছুদিন ক্ষমা করিতে পারেন কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে অনেক সামাজিক নির্য্যাতন সহিতে হয়। অর্থাভাব অথবা অন্যান্য কারণে পুরুষ যদি বিবাহ না করেন, তাহাতে তাঁহাকে লাঞ্ছিত বা সমাজচ্যুত হইতে হয় না, কিন্তু সামাজিক নিয়মানুসারে কন্যার বিবাহ অপরিহার্য্য হইয়াছে। এই কারণে একদা রাজপুতনা, মালব প্রভৃতি স্থানে রাজপুত জাতির মধ্যে এক ভয়ানক নৃশংস নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকাল হইতে রাজপুতদিগের কন্যার বিবাহ এত ব্যয় সঙ্কুল ছিল যে অর্থাভাবে অনেকে তুল্য মর্য্যাদাপন্ন পাত্রে কন্যাদান করিতে পারিত না, অথচ নিম্ন শ্রেণীস্থ পাত্রে কন্যার বিবাহ দিলে সমাজে বিশেষ রূপে অপমানিত হইতে হইত। সুতরাং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র রাজপুতগণের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইত। এই নিদারুণ বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাহারা যে রাক্ষসোচিত নৃশংস উপায় অবলম্বন করিত তাহা শুনিলে ভীত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহারা নবজাতা কন্যা সন্তানকে অনাহারে রাখিয়া অথবা লবণ বা অহিফেনাদি সেবন করাইয়া তাহাকে হত্যা করিত। হায়! এই নির্ম্মম নিয়ম বহুকাল পর্য্যন্ত রাজপুত জাতি মধ্যে প্রচলিত ছিল। মাতা পিতা যে কত স্নেহের ধন সোণার পুত্তলিদিগকে স্বহস্তে বধ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সামাজিক অভিমান এবং লোক লজ্জা মানবকে এমনই হৃদয়হীন ও পিশাচবৎ করিতে পারে! যাহা হউক পরিশেষে ভগবদ্ প্রেরণায় যিনি ভারতের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী সহৃদয়, সদাশয় রাজপ্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই মহাত্মা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের এবং আরও কতিপয় মহাপ্রাণ দেশীয় ও ইংরেজের একান্ত যত্ন ও চেষ্টার ফলে এই নিদারুণ নিয়ম রহিত হইয়াছে।

হায় মাতৃবঙ্গভূমি! তোমার অদৃষ্টে না জানি কত আছে? ভগবান তোমায় অভাগিনী কুমারীগণকে রক্ষা করুন।

কৌলীন্য প্রথা হইতে এ দেশে প্রথম বরপণ প্রচলিত হয়। কিন্তু তাহা কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং এখনকার সহিত তুলনায় তাহার পরিমাণও সামান্য ছিল।

কৌলীন্য প্রথানুসারে কুলীন ব্রাহ্মণগণ কুল মর্য্যাদা সম্পন্ন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতেন। সুযোগ্য পাত্রে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, বরকে এক মোহর অথবা ষোড়শ মুদ্রা প্রদানের রীতি ছিল। বিবাহের পরে কুলীন ব্রাহ্মণ বধূকে পিত্রালয়ে রাখিয়া দিতেন। কুলীন কন্যাগণের ভাগ্যে প্রায়ই পতিগৃহে বাস হইত না। কুলীনেরা যখন শ্বশুরালয়ে যাইতেন তখন পত্নী অথবা শ্বশুর প্রদত্ত অর্থ "মর্য্যাদা" স্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরে পদধৌত ও পত্নী সম্ভাষণ করিতেন। তাঁহারা মর্য্যাদা না পাইলে আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিতেন এবং যতক্ষণ মর্য্যাদা না পাইতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্বশুর গৃহে স্নানাহার কিছুই করিতেন না। কুলীন ব্রাহ্মণগণ বহু বিবাহ করিতেন। সেই বিবাহে এবং পরে যৌতুক ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত অর্থে প্রধানতঃ তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এতদ্ভিন্ন যে সকল কুলীন "স্বকৃত ভঙ্গ" হইতেন, অর্থাৎ কুলীন কন্যার পরিবর্ত্তে বংশজের কন্যা বিবাহ করিতেন, তাঁহারা কন্যা পক্ষ হইতে চারি, পাঁচ শত, এমন কি সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন। কুলীন কন্যাগণ উপযুক্ত কুলশীল সম্পন্ন পাত্র না হইলে বিবাহিতা হইতে পারিতেন না। সেই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ষাটি, সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিতেন। সেই বয়সেও পাত্র মিলিলে, এমন কি বালক বর যুটিলে ও বৃদ্ধা কুমারীদিগকে তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হইত। নিতান্ত পাত্রাভাব ঘটিলে কুলীন কুমারীগণ চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়াই মানব লীলা সংবরণ করিতেন। এই সকল কার্য্যে সমাজ তাঁহাদিগের প্রতি কোনও দোষারোপ করিত না। কুলীন কন্যাগণ এবম্বিধ দুরদৃষ্ট লইয়া জন্মগ্রহণ করিত বলিয়া তাহারা ভূমিষ্ট হইলে সূতিকা গৃহে আনন্দধ্বনির পরিবর্ত্তে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইত। মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ তাহাদের মৃত্যু কামনা করিতেন। পরে মঙ্গল বিধাতা ভগবানের কৃপায় প্রাতঃস্মরনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ দেশ হিতৈষী মহাত্মাদিগের প্রভূত চেষ্টার ফলেও জন সমাজে সুশিক্ষা বিস্তার হওয়াতে এই অনার্য্যোচিত কৌলীন্য প্রথা অনেক অংশে নিবারিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এই কৌলীন্য প্রথা হইতে বঙ্গদেশে প্রথমে বরপণ প্রবর্ত্তিত হয়, এবং ঐ বরপণ পূর্ব্বে কেবল কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছিল, সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে নহে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, বঙ্গদেশে বর্ত্তমান বরপণ গ্রহণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমে ইহা প্রধানতঃ কলিকাতার মধ্যে প্রচলিত হয়, ক্রমশঃ সংক্রামক রোগের ন্যায় সমস্ত বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যদিও বরপণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যেই বিশেষরূপে প্রচলিত, তথাপি কায়স্থদিগের মধ্যেই ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক, এ কথা অনেকেই জানেন। বরপণে যেমন রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক,

বংশজ, কুলীন প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের পার্থক্য নাই, সেইরূপ উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ এবং কুলীন, মৌলিক ও বংশজ বলিয়া কায়স্থদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই সকলেই বরপণ লইতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথমতঃ এই বরপণ কৃতবিদ্য অর্থাৎ পাশ করা বরেরই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু এখন আর পাশ করা বর বলিয়া নহে, যাহার সামান্যরূপ ভরণ-পোষণের সংস্থান আছে, যাহার লেখা পড়ায় কিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞান আছে, যাহার সন্তানাদি না হইতেই প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, যে কৃত বিদ্য বা উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ (প্রৌঢ় হউক আর যুবা হউক), যে দুই চারিটী সন্তানের জনক হইয়া বিপত্নীক হইয়াছে, যে বর্ত্তমান কালে দরিদ্র হইলেও ধনীর প্রপৌত্র, যে নিজে দরিদ্র ও মূর্খ হইলেও কোন কৃতী, প্রথিতযশ ব্যক্তির শ্যালক, ভাগিনেয় কিম্বা তদপেক্ষা দূরতর সম্বন্ধীয় —ইহারা সকলেই বরপণ দাবী করিতেছে। অধিক কি পাঁচ শত বরের মধ্যে দুইজন বর যদি পণ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সৌভাগ্য মনে করিতে হয়। এই দারুণ পণ প্রথা এ দেশে কেন উপস্থিত হইল ?

অতি পূর্ব্ব কাল হইতে এ দেশে কন্যা বিবাহের সময়ে লোকে সাধ্যানুসারে যৌতুকাদি প্রদান করিত, কিন্তু তাহাতে বর পক্ষ বিশেষ কোন দাবী করিতেন না। যেখানে পাত্রী বর পক্ষের মনোনীতা হইত সেখানে তাঁহারা কিছুই বলিতেন না। তবে কন্যা কালো বা কুৎসিত হইলে কন্যা-পক্ষ বস্ত্রালঙ্কার (কোথাও বা ভূসম্পত্তি) অপেক্ষা কৃত অধিক পরিমাণে দিয়া বর পক্ষের মনস্তুষ্টি করিতেন। কিন্তু এখন-কার দিনে দেখা যায় যে, কত স্থানে বর নিজে কন্যা দেখিয়া মনোনীত করিলেন, অভিভাবকেরা ঠিকুজী কোষ্ঠি মিলাইয়া "উত্তম মিলন" স্থির বুঝিলেন, তথাপি প্রণের নগদ টাকা কম হইল বলিয়া সেই বিবাহের সম্বন্ধ অচিরকাল মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল।—জল বুদ্বুদের ন্যায় জলে মিশাইল। অন্যত্র অধিকতর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সেই বর আনন্দের সহিত সেই খানেই বিবাহ করি-লেন! এখন কথা এই যে এ বরপণ এ দেশে কোথা হইতে উপস্থিত হইল ?

অনেকে বলেন, এই পণ প্রথা কন্যা পণের প্রতিক্রিয়া। কেন না বর ও কন্যার মধ্যে—পুরুষ ও স্ত্রী লোকের মধ্যে—পুরুষ সর্ব্বতোভাবে প্রবল। অতএব যে মূল্য দিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত, তদপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে পতি লাভ করাই স্ত্রী জাতির পক্ষে সমীচীন। এই যুক্তি বরপণের আংশিক কারণ হইলেও উহার মুখ্য কারণ স্বতন্ত্র। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে তাহার যেরূপ উপলব্ধি হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিতেছি।

অনেকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, বঙ্গ-বাসিদিগের অনুচিকীর্ষা বৃত্তি অতীব প্রবল। বঙ্গবাসির বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি যে দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ

করিতেছে, এই অনুচিকীর্ষা বৃত্তির প্রবলতা তাহার এক প্রধান কারণ। বর্ত্তমান কালে ইংরেজ আমাদের রাজা, অধ্যবসায়, সাহস, জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বাবলম্বন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, রাজনীতি ও বাণিজ্যে বর্ত্তমানকালে ইংরেজ প্রভূত ক্ষমতাশালী। ইংরেজী শিক্ষায় অনেক বিষয়ে বঙ্গবাসির মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় বিলাস-বিমুখতা, ইয়োরোপের চাকচিক্যপূর্ণ সভ্যতা-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। অনুচিকির্ষু বঙ্গবাসী বেশ-ভূষায় ও আচার ব্যবহারে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে সেই অনুকরণ-প্রিয় বঙ্গবাসী যখন জানিতে পারিল যে, যে ইংরেজ জাতিকে তাহারা "আদর্শ জাতি" বলিয়া মনে করিতেছে, সেই জাতি (পূর্ব্বানুরাগ প্রথা সত্বেও) পত্নীর পিতৃপক্ষ হইতে প্রচুর ধন লাভ করে, অথবা সেইরূপে প্রচুর ধন লাভ করিতে পারিলে তবে পত্নী গ্রহণ করে * তখন তাহারাও সেইরূপ আরম্ভ করিল।

ক্রমশঃ

যামিনীর আত্মকথা।

সন্তানের প্রতি মায়া মাতার হৃদয়ে অদম্য। সে সময়ে ক্রোধের বশে পুত্রকে কটু কথা বলিয়া ভৎসনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, পুত্রের মুখ না দেখিয়া জননীর প্রাণে ভীষণ চিন্তাস্রোত বহিতে লাগিল।

আশায়, নিরাশায়, উৎকণ্ঠায় যেন ছটফট করিয়া কিয়ৎক্ষণ কাটাইলেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, যেমন সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণ ধরণীকে উত্তপ্ত হইতে উত্তপ্ততর করিয়া তুলিতেছিল, সেইরূপ মাতার হৃদয় পুত্র-বিরহে অধিকতর আকুল হইয়া উঠিল। সেই আকাঙ্ক্ষা বিক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ লইয়া, একে একে গৃহ কর্ম্ম সকল সারিলেন বটে, কিন্তু অশ্রুবন্যা আর বাধা মানে না। কাজেই সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ নিরম্বু হইয়া বিরলে বসিয়া কেবল রোদন করিতে করিতে তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর চরণে নানাবিধ মানসিক করিয়া রাখিতেছেন। যেদিন হারানিধি ঘরে আসিবেন সেই দিনই প্রতিশ্রুত উপহারে দেবতাকে তুষ্ট করিবেন।

কষ্টে পড়িলে মানুষের মনে উপায়ও জাগিয়া উঠে। অবশেষে মাতার মনে এক কৌশল জাগিল। হঠাৎ উঠিয়া তিনি স্বামীর নিকট গেলেন। রাগে, দুঃখে, ভাবনায়, উচিত, অনুচিত, অনেক আলাপ প্রলাপের পর, চাকরকে হেড মাষ্টারের বাঙ্গালাতে

---

* ব্যক্তি বিশেষের কথা আমাদের আলোচ্য নহে। সাধারণের কথাই বলিতেছি।

পুত্রের সংবাদের নিমিত্ত পাঠাইয়া পথ পানে চাহিয়া রহিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়, সাহেবের বিশ্রামাগারে এখনও দাস দাসী কেহ যাইতে সম্মত নহে। এদিকে প্রতীক্ষায় প্রতি মুহূর্ত্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। যাহা হউক সুঘটনাক্রমে সেই সময়ে একটা টেলিগ্রাম লইয়া পিয়ন উপস্থিত হইল, সুতরাং আরদালি সেইজন্য হুজুরের নিকট যখন সংবাদ দিল সেই সময়ে প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসু ভৃত্যেরও কথা তাঁহাকে বলিল।

সাহেব একে দয়ালু স্বভাব তাহাতে ভৃত্য জানাইতেছিল যে তাহার প্রভু বাড়ীতে কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শুনিবামাত্র তিনি স্বয়ং বাহিরে আসিয়া চাকরকে কহিলেন তোমার বাবুর জন্য কোন ভয় ভাবনার কারণ নাই, কোন বিশেষ কাজে দুই চারি দিনের জন্য তাঁহাকে নিকটে পাঠাইয়াছি শীঘ্রই আসিবেন।" ভৃত্য আশ্বস্ত মনে আসিয়া কর্ত্রীকে এই সম্বাদ দিবামাত্র জননী একেবারে তেলে বেগুণে, জলিয়া উঠিলেন। সন্তান বৎসলা এখন রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হেড মাষ্টার ও তাঁহার উদ্ধতন পুরুষ পর্য্যন্ত যথেষ্ট সম্মানিত করিয়া স্বামীকে কহিলেন তুমি যেমন ভাবা গঙ্গারাম কিছু বোঝনা, সর্ব্বনাশ হয়েছে, ছেলেও গেল আতও গেল, ঐ পোড়ার মুখো হেড মাষ্টার তাকে খৃষ্টান করবে বলিয়া কোথায় সরিয়ে দিয়েছে। এখনি যাও, আমার ছেলে এনে দাও নতুবা আমি এ প্রাণ রাখবো না।"

গৃহিণীর জলন্ত বহ্নি সদৃশ উগ্ররূপ দেখিয়া নিরীহ ব্রাহ্মণ আরও কষ্টে পড়িলেন। স্বভাবতঃ তাঁহার প্রকৃতি শান্ত ও নম্র ছিল তাহার উপরে পুত্রের নিরুদ্দেশ হওয়াতে দুঃখ ও চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

স্ত্রীকে কোন উত্তর না দিয়া তিনি চাদর খানি কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন ও সোজা হেড মাষ্টারের বাঙ্গালায় উপনীত হইলেন।

সাহেব উহাঁকে দেখিবামাত্র আগমনের কারণ বুঝিতে পারিলেন। ঈষৎ হাস্য সহকারে করমর্দ্দন পূর্ব্বক কহিলেন বাবু, আপনার পুত্র টাকা উপার্জ্জন করিতে গিয়াছে, আপনি শীঘ্রই তাহার পত্র পাইবেন। আপনার স্ত্রীকে নিশ্চিন্ত করুন, উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই।"

"সে কি মহাশয়? সে যে ছেলে মানুষ সবে ষোল বৎসর বয়স সে টাকা উপার্জ্জনের কি জানে? ইহা কি সম্ভব? আচ্ছা, আপনি যখন বলিতেছেন, আমি আপনার কথায় উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। ঈশ্বর সর্ব্বত্র তাহাকে রক্ষা করুন" এই বলিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্যম ও উৎসাহ থাকিলে, মানুষের "উন্নতির পথে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে কষ্ট হয় না। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ।"

পিতা সেই দশটি টাকা পাথেয় লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি অতি কষ্টে গন্তব্যস্থানে পৌছিলেন। কেবল মাত্র হাতে তখন দুইটি টাকা আছে। কালের মহিমা আশ্চর্য্য। শতাব্দী প্রায় কাটিয়া গিয়াছে প্রকৃতির কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই সঙ্গে মানুষের কত উন্নতি অবনতি হইয়াছে। দেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়াছে। সেকালে দেশে পাশ্চাত্য বিস্তার এত প্রভাব ছিল না, যৎসামান্য ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া লোকে কত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে? এখনকার কালে ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও লোকে তদুপযুক্ত অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ নহে। হেড মাষ্টার সাহেবের বন্ধুও একজন ইংরাজ। আগ্রায় ইঞ্জিনিয়ারী কার্য্য করেন।

পিতা অসম সাহস ও অধ্যবসায় বলে খুঁজিতে খুঁজিতে শিক্ষক মহাশয়ের বন্ধুর নিকটে উপস্থিত হইলেন।

একে পথের ক্লেশ, তাহাতে প্রায় অনাহারী, মলিন বেশ, মনের অবসাদে সে সময় তাঁহার চেহারাটি এমন হইয়াছিল যে তাঁহাকে ভদ্র সন্তান বলিয়া চেনা কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু গ্রহ সুপ্রসন্ন বলিয়া তাঁহাকে কেহ ভিক্ষুক, অনাথা, বা জুয়াচোর বলিয়া তাড়াইল না। তখনকার দিনে সকলে বাঙ্গালী জাতিকে আরও সম্মান ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখিত।

বেলা অবসান হইয়াছে, অস্তোন্মুখ রবি আকাশ লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছে। বৈকালিক সমীরণ বৃক্ষের পত্র দোলাইয়া মাঠে মাঠে শস্যের উপর লুটাইয়া পড়িতেছে। পক্ষিণী নীড়াভিমুখী হইয়া কোমল কুজনে পক্ষীকে আহ্বান করিতেছে, "এস সখে, চল যাই, সন্ধ্যা এল বেলা নাই"। প্রিয়তমকে একা রাখিয়া বিহগিনীর যাইতে মন সরিতেছে না। ওদিকে কুলায় শাবকেরা মুখগুলি তাহার নয়ন ও প্রাণে জাগিয়া উঠিয়া চিত্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। সারাদিনের অদর্শনে এখন সে কাতর হইয়াছে তাহার প্রাণে প্রেমলহরী উথলিয়া উঠিয়াছে।

বিহঙ্গম কর্ম্মক্ষেত্রে নিমগন। তাহার নেত্রে কর্ত্তব্যের কঠোর দায়িত্ব বিদ্যমান। প্রিয়ার অপেক্ষিত মুখপানে চাহিবার তাহার মোটে সময় নাই। কিন্তু প্রকৃতির প্রাণে তাহা আর সহিল কই। তিনি ধূসর অঁাচলে মুখ ঢাকিলেন। সুতরাং কর্ম্মী মাত্রেই কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিল।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সস্ত্রীক সজ্জিত হইয়া পোর্টিকোতে উপস্থিত হইয়াছেন। ফিটন্ সেখানে প্রস্তুত। পিতা নির্ভয়ে একেবারে সাহেবের সম্মুখীন হইয়া বিনীত ভাবে অভিবাদন পূর্ব্বক হেড মাষ্টারের পত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

জগতে বাল্যবন্ধু সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। বিশেষ সহপাটির প্রণয় জীবনে একটি পরম প্রীতিপদ ও উপকারী শক্তি।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, বাল্য সহচরের হস্তাক্ষর দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাহাতে কি যে লিখিত ছিল তাহা জানি না, এক এক বার চিঠিখানি পড়েন আর পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখেন। অবশেষে সাহেব খানসামাকে আদেশ করিলেন, "এই বাবুকে একখানি ঘর ও ইহার যাহা যাহা আবশ্যক হয় তাহা দেও।"

এইরূপ আদেশের পর তিনি সস্ত্রীক সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পরদিন বেলা আটটার সময় সাহেব পিতাকে ডাকিয়া কহিলেন "দেখ বাবু! আমি তোমাকে কি কাজ দিব? তোমার লেখা পড়া অপেক্ষা উদ্যম, অধ্যবসায় ও সাহস দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কেবল আমার কুলিদের হিসাব পত্র রাখিবে, আর রাত্রিতে একটু একটু ইংরাজী পড়িবে, আমি তোমাকে পনর টাকা করিয়া দিব। ইহার পর পিতার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া কহিলেন উপস্থিত তোমার যাহা যাহা আবশ্যক হয় ইহাতে তাহা করিয়া লও।

সেই পাঁচ টাকাই তখন পিতার পক্ষে পাঁচ মোহর হইল। মানুষের আহার অভাবে যেমন ক্লেশ, পরিচ্ছদের অভাব যে তদপেক্ষা অল্প কষ্টদায়ক তাহা নহে। এক বস্ত্র হইয়া পিতা বড়ই মনের কষ্টে কাল কাটাইতে ছিলেন, অপরিচ্ছন্নতার গ্লানি তাঁহাকে বড়ই পীড়া দিতে ছিল, এই জন্য প্রথমেই বেশ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। আহার সম্বন্ধে তিনি অনাড়ম্বর ছিলেন, কেবল দুগ্ধই তাঁহার প্রধান খাদ্য ছিল।

পিতার বিদ্যা অল্প হইলেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় শীঘ্রই প্রকাশ হইয়াছিল। সাহেব তাঁহাকে ইহার পর ওভারসিয়ার হইবার মত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সে কালে এ সকল শিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ কলেজে পারদর্শিতা না দেখাইলেও এরূপ কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া দুর্লভ ছিল না।

পিতার সুসময় আসিয়াছিল, তিনি সাহেবের সুনজরে ত পড়িয়া ছিলেন, আবার হঠাৎ একদিন মেম সাহেব ডাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন—"বাবু! তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দয়া হয় অতএব আমি তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে তুমি আমার সংসারের হিসাব রাখিও আমি তোমাকে মাসে মাসে দশ টাকা করিয়া দিব।

মেম সাহেবের এই অনুগ্রহে পিতার মনে আশাতীত আনন্দ হইল। তিনি করযোড়ে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিলেন, "মাতঃ! আমি জানি না কি বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিব। এ উপকারের নিমিত্ত আমি চিরজীবন আপনাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। ঈশ্বর আপনাদিগকে সুখে রাখুন।

ক্রমশঃ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

একেশ্বর বাদী সম্মিলন — এবার আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ইউনিটেরিয়ান প্রচারক রেভারেণ্ড ডাক্তার স্যাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব কংগ্রেসের একেশ্বরবাদী সম্মিলনীর সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে আমেরিকা হইতে কলিকাতায় আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসিদিগের সাহার্য্যার্থ ভিক্টোরিয়া স্কুল গৃহে মহিলাদিগের একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বহু সম্রান্ত রমণী সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে ১৭০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

নূতন প্রস্তাব—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে যুক্তপ্রদেশ, বাঙ্গালা, বিহার ও মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি লইয়া পুনরায় নূতন প্রদেশ গঠন করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

ভারত সচিবের মন্ত্রণা সভার নূতন সদস্য স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত কে, সি, এস, আই মহোদয় এক বৎসরের জন্য ইণ্ডিয়া কাউনসিলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারত সচিব মহাশয় যখন না থাকিবেন তখন গুপ্ত মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসিদিগের সাহায্যার্থ সম্প্রতি টাউন হলে এক মহা সভা হইয়া গিয়াছে, বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ঐ সভায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই কথা বলিয়া এলান থরসবাই তাঁহার জন নামীয় একজন ভৃত্যকে কোন কার্য্যের আদেশ দিবার জন্য জানালার নিকটে গমন করিলেন। ইতবৎসরে গিলিয়ান টেবিল হইতে এক খানা সংবাদপত্র অন্য মনস্ক ভাবে তুলিয়া পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিল। সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি লিখিত রহিয়াছে—"লর্ড আম্ব্রিডেবলের কন্যা সিলভিয়া আরমিডেবলের সহিত মেজর জেনারেল হাগ ক্রেজারের বিবাহ এই সপ্তাহের মধ্যেই সম্পন্ন হইবে।" এই সংবাদ পাঠে গিলিয়ান চমকিয়া উঠিল। এলানি থরসবাইয়ের পূর্ব্ব বাগদত্ত সিলভিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ তবে সত্য সত্যই ভঙ্গ হইয়াছে। সে ভাবিল হায়! আমারই জন্য এই ঘটনা

ঘটিল। মিস্ লেথাম যদি আমাকে ব্যারণস্কশের জমীদারীর উত্তরাধিকারিণী না করিতেন তবে নিশ্চয়ই এলান থরসবাই ব্যারণস্কশ জমিদারীর অধিকারী হইতেন। তাহা হইলে লর্ড আরমিডেবলেরও কন্যার তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার কোন আপত্তি থাকিত না"। ইতি মধ্যে এলান থরসবাই গিলিয়ানের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন "ব্যাপার কি ? আপনাকে এরূপ অস্থির দেখাইতেছে কেন ? অবশ্য আপনি সংবাদ পত্রে কোন মন্দ সম্বাদ পাঠ করেন নাই ?

এই বলিয়া গিলিয়ান পঠিত সংবাদ পত্রখানি উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। গিলিয়ান তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁহার দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "আমি ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না।"

এলান থরসবাই গিলিয়ানের দিকে ফিরিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন "আপনি কি লেডি সিলভিয়ার বিবাহ সংবাদের বিষয় বলিতেছেন ? ইহা সম্পূর্ণ সত্য আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন আমি ইহা শুনিয়াছিলাম।" গিলিয়ান তাহার কথার উত্তরে বলিল "আমি লেডি সিলভিয়ার অপর লোকের সহিত বিবাহ সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।"

এলান থরসবাই বলিলেন "কেন আপনি দুঃখিত হইতেছেন ? আমার বিশ্বাস লর্ড আরমিডেবল মেজর ক্রেকারকে জামাতা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। আর মিস্ আরমিডেবলের পক্ষেও এই বিবাহ খুব সুখের হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। তবে কেন আপনি দুঃখিত হইতেছেন ?

গিলিয়ান অপ্রস্তুত হইয়া বলিল আমি জানি না আমি কেন দুঃখিত হইতেছি। এক্ষণে আমি যাই, বোধ হয় মিসেস থরসবাইয়ের আমাকে আবশ্যক হইয়া থাকিবে।

এলান থরসবাই তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "না, আমার ঠাকুর মার এখন আপনাকে আবশ্যক হয় নাই। তিনি এতক্ষণে তাঁহার প্রাতঃ ভোজন শেষ করিয়াছেন। আমার জানিতে ইচ্ছা হয় কেন আপনি সিলভিয়ার বিবাহ সংবাদে দুঃখিত হইয়াছেন ? তবে কি আপনি আমার জন্য দুঃখিত হইয়াছেন ?"

গিলিয়ান দুঃখিত হইয়া বলিল "আমি আপনার জন্য দুঃখিত হইয়া অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছি।"

এলান থরসবাই গিলিয়ানের এই উত্তরে জোরের সহিত বলিলেন "আপনি যথার্থই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছেন। মিস্ আরমিডেবলের অপরের সহিত বিবাহ ব্যাপারে আমার দুঃখের কোন কারণ নাই। আপনি কি তাহা জানেন না ? আপনি কি তাহা বুঝিতে পারেন না ?

গিলিয়ান এলান থরসবাইয়ের এই কথায় লজ্জিত ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল।

এলান থরসবাই পুনরায় বলিলেন আপনি কি জানেন না যে সে দিন সন্ধ্যাকালে হাইডপার্কের সেই প্রথম দর্শনাবধি কাহার মধুর স্মৃতি আমার সঙ্গের সঙ্গী হইয়াছে? আবার যখন আপনাকে পুনরায় এখানে দেখিলাম তখন আমি বুঝিলাম যে আপনিই আমার জীবনের আশার আলোক এবং আমি কতবার আপনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। কিন্তু একজন দরিদ্র কৃষকের স্ত্রী হইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ উপস্থিত হইয়াছে। বলুন এখন আপনাকে বিবাহ করিবার আশা কি আমি করিতে পারি?

গিলিয়ান বলিল "প্রিয় এলান আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে আমার সম্বন্ধে কোন একটি বিশেষ কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

এলান থরসবাই বিষাদ পূর্ণ স্বরে বলিলেন "সে কথা কি? তুমি পূর্ব্বে আর কাহাকে ভাল বাসিতে তাহাই কি আমাকে বলিতে চাও? তবে কি আমার তোমাকে বিবাহ করিবার কোন আশা নাই?

গিলিয়ান এলান থরসবাইয়ের এই কথায় অধীর হইয়া বলিল "না না, এলান এ জগতে তোমাকেই আমি প্রথম ভাল বাসিয়াছি, অন্য কাহাকেও ভালবাসি নাই।

তৎপরে এলান থরসবাই আগ্রহ পূর্ণ স্বরে বলিলেন "তবে এখন অন্য কোন বিষয় উত্থাপন করিবার আবশ্যক নাই। আমাদের বিবাহের উপরই আমার জীবনের সমস্ত সুখ নির্ভর করিতেছে, আর কোন কথার প্রয়োজন নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নকাল। নটন হল প্রস্থানোন্মুখ সূর্য্যের আলোকে হাস্য করিতেছিল। সকলে বসিবার ঘরে উপবেশন করিয়াছিলেন এমন সময়ে মিসেস থরসবাই পশম বুনন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিরাশ ভাবে বলিলেন "এই গলাবন্ধের একটা ঘর পড়িয়া গিয়াছে, তাহা আমি আর তুলিতে পারিতেছি না।

গিলিয়ান মিসেস থরসবাইয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল "মিসেস্ থরসবাই গলাবন্ধটা আমাকে দিন, আমি ইহার ঘরটা তুলিয়া দিতেছি।

এলান থরসবাই চিমনির নিকট উপবেশন করিয়া তাঁহার সপ্রেম কটাক্ষপাতে গিলিয়ানকে লজ্জায় আরক্তিম ও বিব্রত হইয়া পড়িতে দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন। যখন গিলিয়ান মিসেস্ থরসবাইকে গলাবন্ধটা ঠিক করিয়া প্রত্যার্পণ করিল, তখন বৃদ্ধা তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল "সিলভিয়া কোন কোন সময় তোমাকে সচরাচর যেরূপ দেখায় তদপেক্ষা আমার প্রতি অধিক দয়াশীলা ও মনোযোগিনী বলিয়া মনে হয়।"

গিলিয়ান যখন গলাবন্ধটি মিসেস্

থরসবাইয়ের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক আপনার বসিবার চৌকিতে গিয়া পুনরায় উপবেশন করিল তখন তাহারি নয়নদ্বয় লজ্জায় আনত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার এইরূপ সলজ্জ ভাব দর্শনে এলান থরসবাইয়ের ওষ্ঠদ্বয় সকৌতুক হাস্যে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এলান থরসবাই অস্পষ্ট স্বরে গিলিয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঠাকুর মা প্রায়ই তোমাকে লেডি সিলভিয়া আরমিডেবল বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন। কেন তিনি এরূপ ভুল করেন ইহা আমার খুব আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।

গিলিয়ান লজ্জিত ভাবে উত্তর করিল "আমি জানি না, কেন তিনি এরূপ ভুল করেন।"

এলান থরসবাই কিছুক্ষণ গিলিয়ানকে নিরব প্রশংসা পূর্ণ কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া দাড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—এখন আমাকে একবার যব ও গমের ক্ষেত দেখিবার জন্য যাইতে হইবে। ক্ষেতটাতে লাঙ্গল দেওয়া হইতেছে। যাহারা লাঙ্গল দিতেছে তাহারা নূতন লোক, নূতন লোকদিগের প্রতি আমার বিশ্বাস হয় না। তাহারা ভাল করিয়া কাজ করিবে কি না বলা যায় না।

এলান থরসবাই যবের ক্ষেত্রে যাইবার জন্য উদ্যত হইবামাত্র সহসা বাটীর প্রবেশ দ্বারে উচ্চ করাঘাতের শব্দ শ্রুত হইল। এলান থরসবাই প্রস্থানে বিরত হইয়া বলিলেন "আমি আশ্চর্য্য হইতেছি -কে আবার এরূপ অসময়ে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন?" কিন্তু সেইক্ষণে বাটীর হানা নাম্নী পরিচারিকা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক মিষ্টার চেকল্যাণ্ড নামক একজন ভদ্রলোকের আগমন জ্ঞাপন করিল। তাহার পরক্ষণেই মিষ্টার চেকল্যাণ্ড গৃহে প্রবেশ করিলে এলান থরসবাই তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক বলিলেন "মিষ্টার চেকল্যাণ্ড, এখানে আপনার সহসা এই আগমন কি জন্য? নর্টন হলের এই সৌভাগ্যের কারণ কি?"

মিষ্টার চেকল্যাণ্ড বলিলেন—না না, আমার আগমনে নর্টন হলের সৌভাগ্যের কোন কারণ নাই। আমি নর্টন হলের নিকটস্থ কোন স্থানে আগমন করিয়াছিলাম। আপনার মিলার এণ্ড নামক জমিদারীর বন্ধক সম্বন্ধে কি করিতে হইবে সে বিষয়ে আমার আপনার উপদেশের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্যই আমি নর্টন হলে আগমন করিয়াছি।

ইহার পর মিষ্টার চেকল্যাণ্ডের দৃষ্টি গিলিয়ানের উপর পতিত হইল। এ স্থানে বলা আবশ্যক যে মিষ্টার চেকল্যাণ্ড গিলিয়ানের একজন এটর্নী। ইহার বিষয় প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বিস্মিত ভাবে বলিলেন "মিস্ সিটন আপনার সহিত এ স্থানে সাক্ষাৎ হওয়া অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমি জানিতাম যে আপনি এখন রিয়াবটিয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।

গিলিয়ান এতক্ষণ পর্য্যন্ত মিষ্টার চেক-ল্যাণ্ডের সহিত নর্টনহলে এই অপ্রতাশিত সাক্ষাৎ হওয়ায় একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে মিষ্টার চেকল্যাণ্ডের জিজ্ঞাসায় সম্পুর্ণ অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর করিল "আমি সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি. বলিতে কি আমি সেখানে একেবারেই যাই নাই। আমি মিসেস থমসবাইয়ের নিকট রহিয়াছি।"

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোম রাজ্যের ইতিহাস)

১২৩ পৃষ্ঠার পর।

১৯ অধ্যায়।

রোমের ভদ্র ও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিবাদ।

৮। প্লীবিয়দিগের ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর লিসিনিয়স ও সেক্সটন নামে দুইজন ট্রিবিউন লিসিনিয়ান রোগেসন্স বলিয়া কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিলেন। তদনুসারে ৩৬৬ খৃঃ পূঃ অব্দে প্লীবিয়েরা কন্সল পদ পাইল এবং খৃঃ পূঃ ৩০০শকে তাহারা পৌরহিত্যের ও অধিকারী হইল।

৯। কিন্তু প্লীবিয়দিগের প্রতি পেট্রিসীয়দিগের যে দ্বেষ ও ঘৃণা, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। যে ব্যক্তি প্লীবিয়দিগের পক্ষ হইয়াছে, পেট্রিসিয়েরা কোন না কোন উপায়ে তাহার বধসাধনের চেষ্টা পাইয়াছে। স্পিউরিয়স কেসস, মিলিয়স এবং মানিলিয়স এই তিন ব্যক্তি প্লীবিয়দিগকে দারুণ দুরবস্থার সময়ে রক্ষা করাতে বিপক্ষেরা রাজ্যাকাঙ্ক্ষী অপবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে কালগ্রাসে প্রেরণ করে এবং অতঃপর গ্রাকাই নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে ও এইজন্য ভয়ানকরূপে হত্যা করে।

১০। খৃঃ ১৩৩ পূঃ প্লীবিয় বংশজাত আফ্রিকা বিজেতা সিপিওর জামাতা টাইবিরিয়স্ গ্রাকস্ দরিদ্র প্লীবিয়দিগের দুঃখ দূরীকরণে সচেষ্ট হইয়া লিসিনিয়ান নিয়ম পুনঃ প্রচলিত করিতে যত্ন পান। পেট্রিসীয়েরা অনেক দিবস সে নিয়ম স্থগিত করিয়া রাখিয়া ছিল, এক্ষণে এই কথা শুনিয়া তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া ৩০০ বন্ধুর সহিত টাইবিরিয়াস্‌কে নিধন করিল। তাঁহার মৃত্যুর ১০ বৎসর পরে তাঁহার ভ্রাতা কেয়স গ্রাকস ভ্রাতার অনুবর্ত্তী হওয়াতে পেট্রিসীয়দিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া হত হইলেন। এইরূপ সাধারণতন্ত্র যতদিন ছিল প্লীবীয়দিগের প্রতি পেট্রিসীয়দিগের দ্বেষানল নির্ব্বাণ হয় নাই কিন্তু শেষে দুই জাতি এক হইয়া গেল।

২০ অধ্যায়।

ডিসেম্বারেট।

১। অনেক দিবস পর্য্যন্ত রোমে কোন নিয়ম পুস্তক ছিল না। ইতঃপূর্ব্বে রাজারা স্বেচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন, পরে কন্সলেরা ও যিনি যখন নিযুক্ত হইতেন তাঁহারা আপনাপন মত চালাইতেন। অবশেষে অনুান ৪৫১ খৃঃ পূঃ অব্দে টারিন্টিলস নামে একজন ট্রিবিউন প্রত্যেক শ্রেণীস্থ লোকের কর্ত্তব্য ঘটিত কতকগুলি নিয়মের প্রস্তাব করেন, কিন্তু পেট্রিসীয়েরা তাহাতে তাঁহার বিপক্ষ হইল।

তিনবার।

(গল্প।)

জে রজার্স একজন খাটি ইংরাজ। ভারতীয় কোন প্রাদেশিক রেলওয়ে বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। রেলওয়ে বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের জীবন কিরূপ বিপদ সঙ্কুল ও দায়িত্বপূর্ণ তাহা সর্ব্বজন বিদিত। এক সেকেণ্ডের তফাতে কিরূপ প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে সে জ্ঞানটা রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের মাথার মধ্যে অহরহ জাগাইয়া রাখিতে হয়। জে রজার্স প্রথম যখন রেলওয়ে বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স খুব অল্প। সেই অপরিণত বয়সে, যখন রক্ত টাটকা, উত্তেজনায় পূর্ণ, তখন অহরহ হট্টাগোল সমাকুল রেলওয়ের কার্য্যটি তাঁহার কেমন এক রূপ নেসার মত মনে হইত। এক এক দিন টেলীগ্রামের পর টেলীগ্রাম আসিতেছে। নবীন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের উপর তলব অমুক রেলওয়ে ষ্টেসনটি অতিরিক্ত বৃষ্টি পতনে প্রায় ধ্বংশোন্মুখ, অতএব অবিলম্বে ইহার সংস্কার দরকার। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের জরুরী উপস্থিত আবশ্যক। যাত্রার জন্য স্পেসেল ট্রেন প্রস্তুত। তার পর ষ্টেসনের পর ষ্টেসন। কি হট্টগোল! কি জনতা! কি উত্তেজনার পর উত্তেজনা! এক একটা বড় জংসনে ট্রেনের পর ট্রেন আসিতেছে। কি অসম্ভব যাত্রীর সমাগম! কি কলরব! খেয়াল উঠিলে আবশ্যক ও অনাবশ্যক সকল স্থলেই একটা মুরুব্বীআনা চাল চালিবার লোভ সম্বরণ করা অনেক সময় নবীন ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। অনেক সময়ে প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ষ্টেসনে নামিয়া ঈষৎ তাচ্ছিল্য ও প্রভুত্ব সূচক ভাবে রেলওয়ের সাধারণ কর্ম্মচারিদিগের সকল কার্য্যের খুটি নাটি ধরিয়া তীব্র সমালোচনা করা তাঁহার কেমন একটা অভ্যাসগত কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। অনেক সময়ে, এমন

কি বড় বড় রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার মুরুব্বীআনা ও হাব ভাবে কেমন যেন তটস্থ হইয়া পড়িত। অল্প বয়স সত্ত্বেও তাঁহার কেমন একটু রাজোচিত গাম্ভীর্য্য দর্শনে, তাঁহার অসহনীয় অনধিকার খামখেয়ালি ও মুরুব্বীআনা ধরণ ধারণটাও তাহারা বেমালুম সহিয়া যাইত। কত সময়ে তাঁহার বিশ্রামের সময় থাকিত না। দিনে, রাত্রিতে কাজের ভিড়েও ব্যস্ততায় তাঁহার দিনগুলি একটা সকম্প বাষ্পস্ফীত উত্তপ্ত এঞ্জিনের ন্যায় দ্রুত সমারোহের সহিত চলিয়া যাইত। কত সময়ে কোথা দিয়া দিন আসিল, রাত্রি যাইল, তাহার একটা হিসাব নিকাশ লইবার তাঁহার একটুও অবসর থাকিত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অহরহ এতদূর উৎকট কর্ম্ম সংগ্রাম তাঁহার যৌবন তারুণ্য সজীব উত্তপ্ত হৃদয়টিকে ক্লান্তি কি অবসাদের বিন্দুমাত্র ছায়াপাতে কিছুমাত্র শীতল করিয়া তুলিতে পারিত না।

তাঁহার সহ কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেরই সারাজীবন দ্রুত এঞ্জিনের ন্যায় রেলওয়ের এলাকাধীন কার্য্যের মধ্যেই আবর্ত্তিত ও ঘুর্ণীত হইয়া আসিতেছে। অনেক স্থলে দেখা যাইত যে তাহাদের জীবন রেখাগুলি রুক্ষতার সাক্ষাৎ গণ্ডিরেখা বদ্ধ, নিরেট ও নিরস। কবিত্ব ও মানবীয় কোমল ভাবাবেশগুলির প্রবেশের রন্ধ্র মাত্র বর্জ্জিত। কিন্তু জে রজার্স সংসার পথে সহজ প্রাপ্য নিত্য কর্ম্ম উত্তাপ শুষ্ক তাঁহার সহকর্ম্মীদের অনুরূপ ব্যক্তিদিগের সম্পূর্ণ বিপরীত সৃষ্টি স্বরূপ ছিলেন। হীম শীতল কনকনে আর হাওয়ার মধ্যে জাত ও বর্দ্ধিত উদ্ভিদ সহসা সূর্য্যালোক উত্তপ্ত শুষ্ক ঝনঝনে আবহাওয়ার মধ্যে পতিত হইলে যেরূপ অবসাদ ত্বরিত আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া বসে, ভারতীয় উগ্র সূর্য্যালোক তপ্ত বায়ু খাটি ইউরোপ পালিত ও বর্দ্ধিত এবং অবারিত সুকোমল কবিত্ব ও ভাবাবেশ-স্নাত জেরজার্সের ইউরোপীয় হৃদয়টিকে অবসাদ শীর্ণ, কর্কশ ও খনখনে করিয়া তুলিতে পারে নাই। দিগদিগন্ত ঝলসিত ভারতীয় সূর্য্যালোক, নিত্য পরিবর্ত্তিত ভারতীয় আবহাওয়ার প্রতি বিরক্তির পরিবর্ত্তে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার কেমন একটা টান জন্মিয়া গিয়াছিল। কতদিন অবসর কালে যখন তাঁহার নির্জ্জন বাংলাখানির চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর চকিত করিয়া ভারতীয় প্রভাতিক প্রতপ্ত সূর্য্যালোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িত, সে সময়ে তিনি প্রশংসাপূর্ণ নয়নে প্রভাতিক সূর্য্যালোককে অভিবাদন করিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিতেন, "কি সুন্দর! কি সুন্দর! এই মহোজ্জ্বল জমকালো প্রভাতের তুলনায় তাঁহার স্বদেশের প্রভাত কি শীর্ণ ও ক্ষীণালোক সম্বল মাত্র। এক কথায় এসিয়ার একান্ত শেষ পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত প্রকৃতির অনুগ্রহ ও আলেখ্য

দেশটির প্রতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কেমন একটা আশ্চর্য্যরূপ মায়া জন্মিয়া গিয়াছিল। অনেক সময়ে তিনি নিজেই বিস্মিত হইতেন ও প্রশ্ন করিতেন যে এই অল্পদিনের প্রবাসে জগতে নিতান্ত অজ্ঞাত ও অপরিচিত এই দেশটির প্রতি তাঁহার কেন এত টান হইল। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর ছিল না। তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেন না কেন ইহার প্রতি তাঁহার এত টান। ভারতের সকলই তাঁহার কেমন একটু শোভন স্বপ্ন ভাবাবেশ মণ্ডিত বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। এই ছায়া ও আলোকের দেশটি কোন মায়ারাজ্য হইতে স্খলিত একখানি দৃশ্যপটের ন্যায় অহরহ ওতঃপ্রোতঃ ভাবে তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিত। তাঁহার মতে এখানকার সবই সুন্দর ও স্বপ্ন দৃষ্ট মায়ালোকে বিধৌত।

উষার ক্ষীণালোকে সদ্য জাগরিত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ভৃত্যের হস্ত হইতে দুইখানি টেলিগ্রাম লইয়া তাড়াতাড়ি তাহাতে একবার চোক বুলাইয়া যাইলেন। টেলিগ্রাম পাঠে তাঁহার নয়নে একটা ত্বরিত দুশ্চিন্তার ছায়া জাগিয়া উঠিল। টেলিগ্রামদ্বয়ের সংবাদ বিশেষ গুরুতর। একটা বড় জংসনে চালকের অমনোযোগে বোম্বে মেলের সহিত এক খানা যাত্রী গাড়ীর ভীষণ সংঘর্ষণের সংবাদ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আর পাঠ করিতে পারিলেন না। তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে টেলিগ্রাম খানা টেবিলের উপর পতিত হইল। একটা অনির্দ্দিষ্ট উৎকণ্ঠায় তাঁহার হৃদয় বাথিত হইতে লাগিল। হায়! হতভাগ্য হতাহতগণ! এখনও হয়ত তাহাদের মধ্যে কাহারও প্রাণ রক্ষা হইতে পারে! এই যে দুর্ঘটনা ইহা কেবলমাত্র দৈবের দুর্ব্বিপাক। কোন মানুষের উপর এ ঘটনা সংঘটনের বিন্দুমাত্র দোষ স্পর্শে না। জে রলার্সের অন্তঃকরণে সর্ব্বাগ্রে এই চিন্তাটাই নিতান্তই অনাহুতভাবে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু আর চিন্তা করিবার সময় ছিল না। তাহার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে চঞ্চল প্রাণ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে উৎকট উৎকণ্ঠা বহন করিয়া ততোধিক বেগে স্পেসেল ট্রেন ক্ষীণ উষালোকে অস্পষ্ট-লক্ষিত প্রান্তর চকিত করিয়া গন্তব্য স্থলাভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইল।

বড় জংসনটি সে দিন অতিরিক্ত কার্য্য বাহুল্যে কেমন যেন গম গম করিতেছিল। চারি দিকে রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণের ত্বরিত সমাবেশ ও দ্রুত পদবিক্ষেপে যেন জংসনটি সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদের ঘর্ম্মাক্ত মুখে একটা গভীর উৎকণ্ঠার ছায়া পড়িয়াছিল। সকলেই শশব্যস্ত। মেল গাড়ীর এঞ্জিন খানি একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ এবং যাত্রিদিগের শকটগুলির অধিকাংশই ভগ্ন। তখন হতাহতগণের সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট। ভগ্ন শকটগুলি সেই হতভাগ্যদিগের ক্ষীণ কাতরধ্বনিতে পূর্ণ। সমস্ত জংসনটি কি যেন একটা শুষ্ক বিভীষিকার ছায়ায় মলিন। এই শীতল মৃত্যু ও বিভীষিকার

বিভৎস অভিনয়ের উপর যখন প্রভাতের উত্তপ্ত অথচ কোমল স্পর্শ অবারিত নদীর স্রোতের ন্যায় উচ্ছলিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন আকস্মিক আশা ও আনন্দের আবির্ভাবের ন্যায় চতুর্দ্দিক কেমন একটু কম কমে হইয়া উঠিল। ভগ্ন শকট হইতে হতাহত যাত্রিগণের উদ্ধার কার্য্যে ব্যস্ত জে রজার্সের সহানুভূতি-ব্যগ্র ও বেদনায় ম্লান মুখও প্রভাত দর্শনে একটু সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হতাহতগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সেদিনকার সেই প্রভাতের আলোক যেন সেই সাক্ষাৎ দৃশ্যমান মৃত্যুর মধ্যে জীবনের প্রোজ্জ্বল সঙ্কেত স্বরূপ সহসা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে হতাহতগণের উদ্ধার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। জংসনটিতে সমবেত সমস্ত কর্ম্মচারিগণই কি যেন এক আশ্চর্য্য উদ্যমের আকর্ষণে অধীর ও ত্রস্তভাবে চতুর্দ্দিকে চলাফেরা করিতে ছিল। কোন স্থানে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভগ্ন শকটের চতুর্দ্দিকে জটলা করিয়া বৃথা জল্পনায় ব্যস্ত। কেহ বা অনাবশ্যক কাজের ওজরে একান্তে ত্রস্ত ভাবে দণ্ডায়মান। কাজের শেষ নাই, ভিড়েরও অন্ত নাই। চূর্ণ শকট ও হতাহতগণের মধ্যে কাহার হস্ত কাহার পদ কাহার মস্তক চূর্ণ। কেহ একেবারে মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত। কেহ বা আতঙ্কে মৃতবৎ মূর্চ্ছা গ্রস্থ। হতাহতদিগের আর্ত্তনাদ চতুর্দ্দিকে কেমন একটা শুষ্ক ঔদাস্যের ভাব সৃষ্টি করিয়া তুলিতে ছিল। চাক্ষুস দৃশ্যমান মৃত্যুর দেদীপ্যমান আবির্ভাব ক্ষেত্রে জে রজার্সের নিকট তাঁহার সমস্ত জীবনের মধ্যে এমন করিয়া আর কখনও সম্পূর্ণ যবনিকা উত্তোলিত করে নাই। জে রজার্স নিমেষ মাত্র কার্য্যে ক্ষান্ত হইয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক প্রভাত রশ্মি মণ্ডিত জগতের দিকে একবার করুণা-ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। হায়! কি বৈপরিত্য! এক দিকে আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে প্রাচুর্য্যে জাগরিত অগাধ স্রোতরেখা, অন্যদিকে মৃত্যু ও নিরাশার কি নির্ম্মম ভ্রুকটি! কিন্তু জে রজার্সের এ সমস্ত ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। তখন তাঁহার অনেক কাজ বাকি পড়িয়া ছিল। অদূরে একখানি অর্দ্ধ ভগ্ন শকট সহসা দীপ্ত প্রভাতের আলোকপাতে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিতে স্নাত হইয়া এই সময়ে তাঁহার করুণা-ব্যগ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইল। তিনি বিস্মিত হইলেন। এতক্ষণ এই শকট খানি তাহার চক্ষুতে পড়ে নাই কেন? ঊষার অস্পষ্ট আলো আঁধারে এতক্ষণ কি ইহা প্রচ্ছন্ন ছিল? শকট খানি রেল পথের এক পার্শ্বদেশ ঠেসিয়া একান্তে অর্দ্ধ এলাইত অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। জে রজার্স ব্যগ্র পদবিক্ষেপে এই শকট খানির সম্মুখিন হইলেন। শকট খানি কি আরোহি শূন্য? তাঁহার মনে চকিতে এই প্রশ্ন উদিত হইল। কিন্তু

এই যে কাহার অস্পষ্ট গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসে আগাগোড়া সমস্ত শকট খানি একবার না একটা করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! এই যে পুনরায় তাহারই একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি! এ কি? ইহা কি কোন জীবিতের অথবা কোন মুমূর্ষের জীবনের শেষ বিদায়ের অভিবাদন-শ্বাস। জে রজার্সের অন্তরে বিদ্যুতের ন্যায় অনুশোচনার একটা কঠোর দ্রুত প্রবাহ বহিয়া যাইল। হায়! এতক্ষণে কেন এই শকট তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই, কিন্তু মৃত অথবা জীবিত যে কেহ হউক না কেন তাহাকে বাহিরে আনিতেই হইবে, তাহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। মুমূর্ষু মানবাত্মার এই শেষ সৌন্দর্য্য ও আলোক পানে মত্ত বহিঃপ্রকৃতির মুক্ত বাহু মধ্যে অনন্ত শোভায় স্নাত হইয়া প্রস্থান কি রমণীয়! জে রজার্স বদ্ধ শকট খানির দৃঢ়রুদ্ধ দ্বার জানালা গুলি সবেগ পদাঘাতে খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর যখন একটা প্রচণ্ড আঘাতে শকট খানির সেই রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন সহসা বাহিরের উজ্জ্বল আলোক প্রবাহ স্নাত শকটের অভ্যন্তর ভাগ ভালরূপে নিরীক্ষণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সম্মুখে অতি নিকটে একটা ধীর সঙ্কোচ পদধ্বনি ঈষৎ সন্ত্রস্তভাবে সহসা ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি সচকিত ত্রস্ত কটাক্ষে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। ভগ্ন শকটের দ্বার দেশে এ কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? জীবনের পূর্ণ ব্যক্ত মূর্ত্তির এ কি সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি রেখা। দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার রাত্রির অবসানে উষার প্রথম উজ্জ্বল দীপ্তি-স্পর্শ সমস্ত বিশ্ব যেমন একটা আকস্মিক বিস্ময়ের সহিত উপভোগ করে, জে রজার্স নিবীড় মৃত্যুর অভিনয় ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ জীবনের পূর্ণ ব্যক্ত মূর্ত্তিটির সহসা আবির্ভাব তেমনি একটা আকস্মিক বিস্ময়ের সহিত উপভোগ করিতে লাগিলেন। বিস্ময়াবেগে কিছুক্ষণ তাঁহার বাক স্ফুর্ত্তি হইল না। ভগ্ন শকটের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান সাক্ষাৎ জীবনের মূর্ত্তি রূপিনীর মুখে ও চক্ষুতে এই সময়ে এই জগতের সহিত যেন এই প্রথম নূতন পরিচয়ের একটি চকিত আভাষের ভাব পরিপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল। ঘনীভূত নিশিথ রাজ্যের চির নিবাসী প্রাণীর মুখে ও চক্ষুতে হটাৎ আলোকের উদ্‌ঘাটিত রাজ্য দর্শনে যেমন একটা ভয় সন্ত্রস্ত সঙ্কোচ জাগরিত হইয়া উঠে, সে দিনকার সেই সদ্য জাগরিত প্রভাতের অংশ রূপিনীর সুদীর্ঘ নয়ন দুটি তেমনি একটা ভয় সন্ত্রস্ত সঙ্কোচে সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিনকার প্রভাত রশ্মি সেই বরণীয়া প্রভাতরাজ্ঞী রূপিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, জে রজার্সের মনে হইতে লাগিল যেন সেই প্রভাত কন্যার হটাৎ আবির্ভাবে তাঁহার পদতলে বিস্তৃত মৃত্যুস্রোতও যেন ক্ষণকালের জন্য নির্ম্মমতা বর্জ্জিত হইয়া উজ্জ্বল জীবনে স্নাত হইয়া উঠিয়াছে এবং কবিত্বের পূর্ণ সুরের ন্যায় ইহারই মধুর নয়নের দৃষ্টিপাতে

সেদিনকার প্রভাতের কোমল সৌন্দর্য্যে হটাৎ যেন সমস্ত জগৎরূপ নিখাদে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। কল্পনার অপ্রত্যাশিত এই দৃশ্যপটের আকস্মিক অবতরনায় জে রজার্স প্রথম কয়েক মূহুর্ত্ত কেমন একরূপ হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এই বিপন্না রমণীর প্রতি এই স্থলে তাঁহার কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের দায়িত্ব কত গুরুতর সে বিষয় ভাবিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার অবসর মাত্র রহিল না। ইতি মধ্যে নবীন প্রভাতের প্রখর আলোক নিখিল বিশ্বকে উষার স্বপ্নাবস্থার অবগুণ্ঠন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে বাস্তবিক সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। চারিদিকে যেন জীবন রেখার একটা তীব্র আলোড়ণ পড়িয়া গিয়াছিল। চারিদিককার সচ্ছল ও সচকিত প্রবাহ ধারায় জে রজার্সের নয়নের সম্মুখ হইতে এতক্ষণ পরে একটা ঘন মায়ার স্বপ্নাবরণ অপসৃত হইল। এতক্ষণ পরে যেন তাঁহার নিজের অস্তিত্ব তাঁহাতে ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কি মন্ত্রবলে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান ব্যাপারে এরূপ বালকবৎ অপব্যবহারের প্রশ্রয় দিতেছিলেন। লজ্জার সঙ্কোচে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু আর এরূপ বিমূঢ়বৎ আচরণের প্রশ্রয় দেওয়া নিতান্তই অন্যায় হইয়া উঠিতেছিল। জে রজার্স যাদুমন্ত্র বিমুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার সমস্ত বিস্ময় ভাব হইতে নিজেকে সবল আকর্ষণে একরূপ টানিয়া লইয়া বিপন্না বিদেশিনীর নিকট অগ্রসর হইলেন।

তখন অনেকটা বেলা হইয়া উঠিয়াছিল। নবীন প্রভাতের টকটকে সোনালী বর্ণছটার পরিবর্ত্তে তীব্র রৌদ্রালোক আকাশ ও ধরণীর বিস্তৃত বক্ষটিকে বেশ একটু তপ্ত ও প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই বিভীষিকার উদ্ঘাটিত নাট্য ক্ষেত্র খানিকটা পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া যখন জে রজার্স ভগ্ন শকটের বিদেশিনী রমণীটিকে লইয়া রেলওয়ের বিশ্রামাগারে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি কেমন একটু আয়াস ও সচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারিনী স্ত্রীলোকটির নিটোল নিখুত ললাটদেশ পার্থিব জীবনের হিল্লোল স্পর্শে সতেজ সজীব ও আরক্তিম বর্ণছটায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এতক্ষণে তাহাকে কোন অপার্থিব রাজ্য নিবাসিনী জীবন হীন প্রাণীর ন্যায় কেমন একরূপ অদ্ভুতরূপ নিরক্ত ও ম্লান দেখাইতেছিল। এতক্ষণ পরে তাঁহার নয়নে চতুর্দ্দিককার জীবন ও জাগরণের দিব্য ছবি সজীব তুলিকা স্পর্শে যেন সুপষ্টতর হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিককার সজীবতা এতক্ষণ পরে যেন তাঁহার কণ্ঠে স্বর ও নয়নে আগ্রহ জাগাইয়া তুলিল, এবং পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিদেশী উদ্ধারকারির সংবাদ লইবার তাহার অবসর হইল। পরে তাঁহার সেই স্বভাবিক সৌন্দার্য ও কোমলতা পূর্ণ নয়নে, একটি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার

ভাবে যেন স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়া উঠিল।

প্রখর অথচ পেলব চিক্কণ রৌদ্রালোক ভেদ করিয়া সকম্পিত স্পর্দ্ধায় নব আনিত ট্রেণ অবশিষ্ট অনাহুত যাত্রিদলকে লইয়া তখন বড় জংসনটি পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার হুইসল ধ্বনিও সুদূর বিলীন প্লাটফর্ম্মে দণ্ডায়মান জে রজার্সের মন্ত্রাবিষ্ট দৃষ্টি ট্রেনের স্বর্প গতির শেষ আবর্ত্তন রেখা খানির শেষ মুহূর্ত্ত অনুসরণে ব্যস্ত রহিয়াছিল। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে ভগবান দেবদূতগণের নিখুত আদর্শে মানব দেহ মনের সৃষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কবিগণ প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল চিত্রাদর্শেই মানব মন গঠিত হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করেন। শাস্ত্রবিদগণ অপেক্ষা কবিগণই মানব চিত্ত অঙ্কন কার্য্যে অধিকতর দক্ষ। শিল্পি চির নবীনতার মন্ত্র সিদ্ধ সরস বসন্তের অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ক্ষণিক আগমন চির শীত প্রভাব শুষ্ক প্রদেশের বনে ও প্রান্তরে চারু যৌবনের যেমন একটি মধুর কনক সজীব উচ্ছলন সমৃদ্ধি ছড়াইয়া দিয়া, তাহার পর তাহার পশ্চাতে একটা উদাস বিস্ময়ের স্মৃতি রাখিয়া প্রস্থান করে, আজিকার প্রভাতের অপ্রত্যাশিত ঘটনা—সেই ভগ্ন শকটের প্রভাতের অধিষ্ঠাত্রি দেবতারূপী সেই বিদেশিনীর প্রথম দর্শন হইতে তাহার শেষ প্রস্থান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটি জে রজার্সের কঠোর শুষ্ক চির কর্ম্ম কোলাহল উচ্ছলিত জীবন বেষ্টন করিয়া চির শীত ঋতু প্রবল প্রদেশে ক্ষণিক বসন্তের আগমনের ন্যায় চারু যৌবনের কি যেন একটি মধুর সরস সৌন্দর্য্যের আবাহন গীতি রচনা করিয়া তুলিতেছিল। প্রস্থানশীল ট্রেণের আরোহিনীর বিদেশী উদ্ধারকারির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা পূর্ণ সপ্রতিভ শেষ দৃষ্টিটি এবং সলজ্জনত গ্রীবার সহিত তাহার শেষ বিদায় অভিবাদনের ভঙ্গিটি শিল্পি কল্পিত মানসী প্রতিমারই প্রতি আরোপনীয় মানবীয় শ্রেষ্ঠ ভাব পরিকল্পিত এবং সেই বিদেশিনী সুন্দরীর সহিত কয়েক ঘণ্টার পরিচয়টি বিজন নদীসৈকতে অকস্মাৎ উচ্ছলিত ঊর্মি প্রবাহের মধুর মর্ম্মর ধ্বনির ন্যায় আপাত উপভোগ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তাঁহার স্বজাতীয় পারসী জাতির উপাস্য চির জাগ্রত চির প্রজ্জলিত অগ্নি দেবতার স্তোত্রগীতির ন্যায় প্রীতি বিজড়িত তাঁহার কণ্ঠ স্বরটি, এবং সেই গরিয়ান চির জাগ্রত দেবতার শিখারই অনুরূপ তাহার মহোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য, গরিমাটি একটি অসমাপ্ত কাব্য গাথার ন্যায় জে রজার্সের মর্ম্মে মর্ম্মে একটি মধুর কল্পনার ভাব জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল আজিকার প্রভাতটি যেন তাহার জীবনের সমস্ত সুখের দিনের একটি পূর্ণ সমষ্টি এবং আজিকার প্রভাতের ঘটনাটির জন্যই যেন তিনি আপনার সমস্ত জীবন ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

নূতন সংবাদ।

১। মিঃ গোখেলে দক্ষিণ আফ্রিকার নিগৃহীত ভারতবাসিদিগের সাহায্যের জন্য দুই লক্ষাধিক টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

২। এদেশের ভদ্রমহিলাগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যাদি যাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারেন তজ্জন্য ৮৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে ১৪ই ডিসেম্বর হইতে একটী মহিলা শিল্পবাজার খোলা হইতেছে।

৩। বড়লাট পত্নী লেডি হার্ডিঞ্জ মহোদয়া আগামী ২১শে মার্চ্চ স্বদেশ যাত্রা করিবেন এরূপ শুনা যাইতেছে।

৪। সম্প্রতি জর্ম্মনিতে মিঃ কালক্রাল নামক একব্যক্তি মনুষ্য শিশুর ন্যায় কিণ্ডার গার্টেন প্রথানুসারে অশ্বদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং ইহাতে আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছেন। এক বৎসরের মধ্যে কোন কোন অশ্ব অঙ্কের যোগ বিয়োগ, গুণ ও ভাগ অবধি শিখিতে সমর্থ হইয়াছে।

৫। সম্প্রতি লণ্ডনে ৺ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে তত্রত্য ব্রহ্মোপাসকগণ এক সভা করিয়াছিলেন। সভায় উপাসনা বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইয়াছিল। ভারত মহিলাদিগের পক্ষ হইতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই সভায় কেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব ও অতীত জীবনের আলোচনা করিয়াছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত ইয়ুরোপীয় নরনারী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৬। দক্ষিণ আফ্রিকার নিগৃহীতদিগের জন্য গুরুকুলের বালকগণ কুলী মজুরের কার্য্য করিয়া ১১০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। বালকদিগের এই মহত্ত্বের জন্য ভগবান্ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

৭। আমাদের বড়লাটপত্নী লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া কলিকাতায় আগমন করিলে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ৩০০০৲ টাকা মূল্যের একখানি অলঙ্কার প্রদান করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। সহৃদয়া লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া এই প্রস্তাবের উত্তরে জানাইয়াছেন ঐ অলঙ্কারের মূল্যে কলিকাতার কোন হাস্পাতালে একজন রোগীর শয্যার বন্দোবস্ত করিলে তিনি অধিকতর সুখী হইবেন। এতদ্বারা লেডী হার্ডিঞ্জের দয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বামারচনা ।

নীরব সাধক ।

১

আমার নিজন ঘরে,
আমি　রহিব একেলা পড়ে,
ধরার আলোক বায়ু
হেথা　পশেনা করুণা করে।

২

চাঁদের অমিয় রাশি,
বিকচ কুসুম হাসি,
এ মিনতি আঁখি আগে
কভু　দিওনা দরশ আসি ।

৩

আমার কুটীর দোরে,
কোকিল পাপিয়া ওরে !
থামিও সবার গান
নিবেদন করযোড়ে ।

৪

অবনীর ভালবাসা,
সুখ-সাধ প্রীতি আশা,
আমার মানস পুরে
কেহ　বেঁধোনা আপন বাসা ।

৫

ভব কোলাহল হ'তে,
আপনারে কোন মতে,
রাখিতে সরায়ে দূরে
বাসনা আমার চিতে ।

৬

বসুধা পাবক প্রায়,
পরশিলে দহে তায়,
অবোধ বুঝেনা তবু
কুহকে ছুটিয়া যায় ।

৭

নিজনে নীরবে আমি,
সমাধিব দিবা যামী,
গোপন সাধনা মম
তব প্রতীক্ষায় স্বামী !

৮

সকল হৃদয় ময়,
সুগভীর আশা রয়,
সাধনার অবসানে
দিবে তুমি পদাশ্রয় ।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।
চট্টগ্রাম ।

জীবন্ত দেবতা ।

জীবন্ত দেবতা মোর
এই ধরা মাঝে,
সাজাতে হয় না তাঁরে
নানা ফুল সাজে

চন্দনে চর্চ্চিত করি,
জাহ্নবীর জলে
পূজিতে হয়না তাঁরে,
ফুল বিল্ব দলে ।

চরণে হয়না দিতে
অর্ঘ্যের অঞ্জলি
ধূপ ধূনা উপচার
নৈবিদ্যের ডালি
আমার 'দেবতা' সে যে
হৃদয়ের ধন,
প্রেম পুষ্পে পূজি আমি
সে দুটী চরণ।
দেহ প্রাণ সঁপে দিছি,
চরণে তাঁহার
কিছু আর রাখি নাই
বলিতে 'আমার'।

শ্রীচারুমতি দেবী।

চির সম্বল।

দাওনি প্রেম দাওনি পুণ্য দাওনি আমায় পবিত্রতা,
কিন্তু দিয়েছ মোরে অনুতাপ কাঁদ্‌ছি বসে সরবদা।
তোমার নাম, তোমার গুণ, তোমারই দত্ত অশ্রুজল,
ইন্দ্রিয়াশক্ত মহাপাপীর ইহাই শুধু চির-সম্বল।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা
ঢাকা।

তোলেন ক্রোড়ে।

একি অপূর্ব্ব শোভা একি অপূর্ব্ব রূপের মাধুরী?
নয়ন মুদে হৃদয় পথে আজি আমি একি হেরি?
একি আস্ত একি হাস্য লীলাময়ের একি লীলা গো?
হরি পাপীর সনে খেল্‌তে আসেন (তাঁর) একি খেলা গো?
সতত আমি মোহেতে ভূলে, দলন করি চরণ তলে,
তাঁর পুনঃ পুনঃ নিষেধ বাণী তবু তাঁর একি ভাব?
দয়াময়ের এ দয়ার কি গো হয়না কভু অভাব?
মানব তাঁর মানব সন্তানকে ফেলে বধ করে,
তবু তিনি করেন না রাগ, কাছে নিয়ে করেন সোহাগ,
জ্ঞান চক্ষু খুলে দিয়ে আদর করি তোলেন ক্রোড়ে।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

---

৩৭ নং মথুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং এ-টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 605. January, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৫ সংখ্যা। { পৌষ, ১৩২০। জানুয়ারী, ১৯১৪ } ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

বিবাহে পণ গ্রহণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বঙ্গবাসিগণ তখন নিজেদের অবস্থা, উপযোগিতা অথবা সামাজিক কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া বরপণ প্রার্থী হইয়া বসিল। এদিকে "সু পাত্র" লোভাকৃষ্ট, ধনবান কন্যাভার-গ্রস্ত তাহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিল। এইরূপে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বরপণ প্রথা ভারতীয় সমাজে বিস্তৃত হইয়া সমাজের অস্থি ও মজ্জা শোষণ করিতে লাগিল। তখন আর পাত্রাপাত্র বিচার নাই, যে "বর" হইয়া আসিবে, সে সেই পণের প্রার্থী হইবে। যে কন্যার বিবাহ দিবে, সে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত হইবে। বরপণ এইরূপেই ভারতীয় সমাজে প্রচলিত হইয়াছে।

এখন, যাঁহারা অন্যান্য সমাজের অনুকরণে এদেশে বরপণ অনুমোদিত করেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে ভারতীয় সমাজ, অপর সমাজের ন্যায় নহে। সে সব দেশে ধনবান ব্যক্তিদিগের সংখ্যা অধিক, ভারতবর্ষে দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক। অপর দেশে কুমারীগণ ধন-শালিনী না হইলে তাহাদিগের অদৃষ্টে প্রায়ই বিবাহ সংঘটন হয় না, তাহারা চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিলেও সমাজ তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না। কিন্তু ভারতীয় সমাজে হিন্দু কুমারীগণের যথাকালে বিবাহ না হইলে, অভিভাবক-গণ বিশেষরূপে সমাজে লাঞ্ছিত, এমন কি সমাজচ্যুত হইয়া থাকেন। অন্যান্য দেশের লোকেরা সাধারণতঃ ভোগ বিলাস পরায়ণ, সেইজন্য প্রচুর অর্থ সঞ্চিত না হইলে যুবকেরা বিবাহিত হইতে চাহে না, এ দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে দার

পরিগ্রহ পূর্ব্বক গার্হস্থ-ধর্ম্ম-পালন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য *। সুতরাং প্রচলিত বরপণ প্রথা যে এদেশের সর্ব্ব-নাশ-কারিণী, একথা সকলেই চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন।

বরপণের অশুভ ফল এদেশে অনেকেই এখন বুঝিতে পারিয়াছেন। বরপণপ্রথা যে কোনক্রমে ভারতবর্ষে প্রার্থনীয় নহে, কত ধনী ব্যক্তি উপযুক্ত পাত্রে কন্যার বিবাহ দিতে গিয়া যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, কত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র যে পথের ভিখারী হইয়াছেন, কত ভদ্রলোক যে শঠ ও প্রবঞ্চক আখ্যা পাইয়াছেন, কতজন দায়ে পড়িয়া ছলনা ও প্রতারণা পূর্ব্বক যে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইতেছেন, এই বরপণ প্রথা হইতে যে কত কুমারী রত্ন অপাত্রে পতিতা হইয়া যাবজ্জীবন মরণাধিক ক্লেশানুভব করিতেছে, এই বরপণ প্রথা হইতে ভারতীয় সমাজের দারুণ আর্থিক দুরবস্থা ও নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, ইহা দেশের অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই অনিষ্টকারী প্রথা নিবারণ কল্পে প্রায় গত ত্রিশ বৎসর হইতে বিবিধ প্রকার চেষ্টা হইতেছে। পূর্ব্বে বিবাহ বিভ্রাট প্রভৃতি দৃশ্য কাব্য হইতে, পরে নানাস্থানের নানা সভা সমিতি হইতে, বেঙ্গলি প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে এবং বহুবিধ কবিতা, ছড়া ইত্যাদি হইতে বরপণের পরপীড়নরূপ হীনতা, মনুষ্যত্ব বর্জ্জন রূপ নীচতা এবং সমাজের অনিষ্টকর কার্য্যের ফল, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে *। কিন্তু অনায়াস-প্রাপ্য অর্থের এমনি মোহিনী শক্তি যে যাঁহারা বরপণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা চক্ষে অঙ্গুলি দিলেও চাহিয়া দেখেন না। নিজেদের অর্থলোলুপতার প্রতিরূপ চক্ষে দেখিয়াও লজ্জিত হন না! হায়! এ দেশের বরপণ প্রথা কবে দূর হইবে?

যাঁহারা বরপণ অনুমোদন করেন, তাঁহারা যে সকল কারণে উহার পক্ষ সমর্থন করেন সেই সকল কারণ এবং তাহার প্রতিবাদ যথাক্রমে বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অনুমোদনের প্রস্তাব সপক্ষে—

১ম। বরপণ প্রচলিত হওয়াতে কন্যা-পণ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ইহা কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে?

---

* আমাদের দেশে শাস্ত্রকারগণ, ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া পুরুষকে বিবাহ করিতে বিশেষরূপে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করাই ইহার এক প্রধান কারণ। বর্ত্তমান কালে এ দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেহ কেহ বিবাহ করিতে অসম্মত হইতেছেন, ইহা ভবিষ্যতের আশঙ্কাপ্রদ। এই স্বেচ্ছাচারিতার ফল অন্যান্য অনেক দেশ ভোগ করিতেছেন। সে সব দেশে আইন করিয়া লোকদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিবার কথা হইতেছে। কেন না এতদ্বারা জনসংখ্যা হ্রাস হইতেছে।

* সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা হইতে বরপণ নিবারণ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু যে দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে লোকের শুভ রূপ চেষ্টা কবে সফল হইবে, ঈশ্বর জানেন।

২য়। যে দরিদ্র যুবক এফ্, এ, পাশ করিয়া বি, এ, পড়ার খরচ যোগাড় করিতে প্পারে না, সে যদি বিবাহের সময়ে শ্বশুরের নিকট হইতে বি, এ, প্রভৃতি পড়ার ব্যয় সংগ্রহ করে, সে কি সমাজের অনুমোদিত নহে?

৩। কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করেন, আরও বিশ হাজার টাকা আয় হইলে তবে পুত্রের বিবাহ দিবেন, কোনও ধনী ব্যক্তি যদি তাঁহাকে বিশ হাজার টাকা দিয়া তাঁহার পুত্রকে কন্যা দান করেন, পুত্রের পিতার এই ধন বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা যদি দূষনীয় হয়, তবে যে সকল ধনকুবের ধনবৃদ্ধির জন্য আরও ব্যবসা বাণিজ্য করেন, তাঁহারা ত বড়ই পাপী?

৪র্থ। বরপক্ষ কন্যা পক্ষের নিকট হইতে টাকা লইয়া সেই টাকা দ্বারা কন্যার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি চেষ্টা করেন, ইহাতে ক্ষতি কি?

৫। সমাজে অল্প টাকা অথবা বিনা টাকায় বরপাত্র পাওয়া যায়, অতএব যে বর কন্যাপক্ষের মনোনীত, সে বর যদি অধিক টাকার প্রার্থি হয় আর তাহা দিতে যদি কন্যাপক্ষ অশক্ত হন, তবে সে বরকে ছাড়িয়া দিয়া, অল্প টাকা বা বিনা টাকায় যে বর বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে কন্যা দান করেন না কেন?

৬ষ্ঠ। বঙ্গে উত্তরাধিকারের অন্যায় বা পক্ষপাত পূর্ণ ব্যবস্থা আছে, তাহার প্রদিবাদ (প্রতীকার?) স্বরূপে ও বর পণ প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত। পুত্র ও কন্যা উভয়ই পিতার সন্তান। কিন্তু পুত্রেরা সমভাগে পৈতৃক সম্পত্তি পাই বেন, কন্যারা কিছুই পাইবেন না কেন? কন্যার পিতা যদি সম্পত্তিশালী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কন্যাদিগকে পুত্র দিগের সহিত সমানরূপে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে বাধ্য করা উচিত। বরপণ দ্বারা ইহা কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হই-তেছে। ইত্যাদি *।

বরপণ প্রথা অনঅনুমোদনের বিরুদ্ধে উত্তর—

১ম। কন্যা পণ প্রথা যদি বরপণের প্রচলনে উঠিয়া গিয়া থাকে, তবে অনে-কেই বলিবেন তাহা "চোর তাড়াইয়া ডাকাত পড়নের" তুল্য। কন্যা পণ অপেক্ষা বরপণ যে সমাজের অধিকতর অনিষ্টকারক, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কন্যাপণ ঘৃণিত প্রথা—বরপণ ভয়ঙ্করী প্রথা।

২। যে ব্যক্তি অর্থাভাবে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহার সুশিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করা ত ধনবান ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। আমা-দের প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা করিতেন, ঋষি কল্প ডাক্তার প্রফুল্ল

---

* এই বর পণ অনুমোদিত প্রস্তাবের সারাংশ, প্রধানতঃ ১৩—১৯ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতী পত্রিকায়, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের লিখিত "বরপণ" প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইল।

প্রঃ লেঃ।

চন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেকে তাহা করেন। তবে বিবাহের জন্য ভাবী শ্বশুরের সহিত এই রূপ একটা বন্দোবস্ত করিয়া মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণকে (তাঁহাদের কন্যা দায় সময়ে) বিপন্ন করা এবং নিজের প্রবৃত্তিকে নীচ ভাবাপন্ন করা কাহারও উচিত নহে। জামাতার এইরূপ সাহায্য প্রার্থনা যেন বরপণ হিসাবে না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩য়। যে সকল ধন কুবের ধনবৃদ্ধির জন্য ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই "পাপী" নহেন। কারণ ধনোপার্জ্জন মনুষ্য জীবনে বিশেষ আবশ্যক। সে জন্য পৌরুষ বা পুরুষকার অবলম্বন করাই মানবের কর্ত্তব্য। তাহা যিনি করেন তিনি ত কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি। একজন (দায় গ্রস্ত) ব্যক্তিকে বাধ্য করিয়া, কৌশল পূর্ব্বক তাহার অর্থ গ্রহণ দ্বারা নিজের ধনবৃদ্ধি আর ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা ধনবৃদ্ধি, এই দুই যে তুল্য নহে, একথা বোধ হয় সকলেই বুঝেন। তথাপি যে দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তর্ক স্থলেও এরূপ কথা বলিতে লজ্জিত না হন, সে দেশের প্রকৃত উন্নতি এখনও অনেক দূরে।

৪র্থ। এখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে সাধারণতঃ আগোগণ্ড শিশু কন্যার বিবাহ হয় না। প্রায়ই দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কা বালিকাদিগের বিবাহ হইয়া থাকে। সেই বয়সে বালিকাদিগের মাতাপিতা প্রভৃতি পিতৃকুলস্থ আত্মীয়গণের প্রতি গভীর মমতা ও সহানুভূতি হইয়া থাকে। অতএব—যাহারা ধনীর কন্যা, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, যাহারা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, পিত্রাদিকে নির্য্যাতন পূর্ব্বক বিবাহ কালে বরপক্ষ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন জানিয়া তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে বিশেষ বেদনা অনুভব করে। এরূপ স্থলে কন্যা পক্ষের নিকট হইতে কৌশল পূর্ব্বক সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সেই কন্যার সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র। বঙ্গকুমারীগণ অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা হউক, তাহারা যখন ভগবদ্ প্রেরণায় মাতৃহৃদয়ের অঙ্কুর লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহারা এতদূর স্বার্থ পরায়ণা নহে যে তাহাদের জন্য তাহাদের পিতা মাতা প্রভৃতি বিশেষ আত্মীয়বর্গ সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, আর তাহারা সেই অর্থ দ্বারা নিজেদের ধনপিপাসা চরিতার্থ করিয়া সুখানুভব করিবে! বরং তাহারা ভাবী স্বামী বা শ্বশুর কুলের অর্থ লোভের আতিশয্যরূপ নীচতা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা, একটা বিতৃষ্ণা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে। এইরূপ অশ্রদ্ধা ভাব বদ্ধ মূল হইলে দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত সুখ শান্তির আশা সবই দূরীভূত হইয়া যায়। আমাদের দেশের কোনও সহৃদয়, সূক্ষ্মদর্শী, সুপ্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন।

"বাবা! থাকুক আমার বিয়ে,
রেখে কোলে কাঁধে বুকে, পালন কল্লে
কত দুখে,

আজো তোমার স্নেহ দয়ায় রয়েছি বাঁচিয়ে।
আজো তোমার এম্নি ব্যাথা, যা' কিছু
পাও যখন যেথা,
পাখীর মত দিচ্চ এনে নিজে না খাইয়ে।
সেই তোমারে চির দুঃখে, ফেল্‌বো যে
গো পাষাণ বুকে,
সে পশুকে পতি বলে পোড়্‌বো লুটাইয়ে?
ঘৃণা নাই কি নারীর মনে, সিদ্ধি নাই কি
নারীর পণে
সংযমে তার যম ডরায়—সরে দাঁড়ায়
গিয়ে!"

বঙ্গদেশের প্রত্যেক বিবাহার্থী যুবকের এই কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ কর কর্ত্তব্য।

৫ম। বোধ হয় সকলেই জানেন, বর্ত্তমান কালে এদেশে প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই। যে শিক্ষা পাইলে রমণীর মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি সমূহ সমুচিত রূপে বিকাশ লাভ করিবে, যে শিক্ষা পাইলে রমণী সুকন্যা, সুভগী, সুভার্য্যা, সুমাতা এবং সুগৃহিনী হইয়া সংসার শান্তিময়, আনন্দময় এবং পুণ্যময় করিবেন, যে শিক্ষা পাইয়া রমণী জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিতা হইয়া, পুরুষ জাতির শ্রদ্ধার পাত্রী রূপে সমাজে তাঁহাদের সহকারিনী ও সহযোগিনী হইবেন, সেই সর্ব্ব কল্যাণময়ী স্ত্রীশিক্ষা, হিন্দু সমাজে এখনও স্বপ্নরাজ্যে অধিষ্ঠান করিতেছে। অতএব কন্যাকে সুপাত্রে—অর্থাৎ সচ্চরিত্র ও কৃতবিদ্য পাত্রে অর্পণ করিয়া পিত্রাদি অভিভাবক কৃতার্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আদরের কন্যা সুপাত্রে অর্পিত হইলে, বর তাঁহার মনোমত রূপে বধূকে গঠন করিয়া লইবেন, ইহাতে কন্যার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা অনেকটা দূর হইয়া তাহার নারী জন্ম সার্থক হইবে, তাঁহারা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে ও কথিত আছে,

"যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।"

মনু ৯। ২২।

কিন্তু সমাজের দুরদৃষ্ট ক্রমে এই সকল "সুপাত্র"ই অধিক পরিমাণে অর্থ দাবী করেন। আশা মরীচিকা-মুগ্ধ কন্যাপক্ষ সেই দাবী পূরণ করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন। অধিকাংশ স্থলে কন্যাপক্ষ এই সকল কারণে মনোনীত পাত্র পাইয়া তাহাকে (অর্থাভাব প্রযুক্ত) পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

কোন কোন স্থলে বর "সুপাত্র" না হইলেও যে টাকার দাবী করেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোন কোন স্থলে অপাত্রও ঐ টাকার দাবী করেন, কেন না কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে কন্যা পক্ষের "জাতি" যাইবে, অতএব বর অপাত্রই হউক আর কুপাত্রই হউক, "পুরুষ ছেলে" ত বটে, সুতরাং সে বিনা টাকায় বিবাহ করিয়া কেন এক জনের

* কন্যাভার পীড়িত পিতার প্রতি কন্যার উক্তি। ৭ম স্তম্ভ।

জাতি রক্ষা করিবে? বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা এইরূপই দাঁড়াইয়াছে।

৬ষ্ঠ। বরপণ অনুমোদনকারী ব্যক্তি গণের ষষ্ঠ প্রস্তাব (অর্থাৎ ধনীদিগের কন্যাকে কিছু সম্পত্তি দান) যে অতি সুযুক্তি পূর্ণ বিজ্ঞোচিত প্রস্তাব তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এদেশে কন্যা-সন্তানদের পক্ষে যে অনেকটা অবিবেচনা হয়, এ কথা যথার্থ। পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করিয়া ভ্রাতা লক্ষপতি বা কোটি-পতি, আর বিধবা ভগিনী আপোগণ্ড সন্তানদিগকে লইয়া গ্রাসাচ্ছদনের নিমিত্ত পরের দাসীত্বেনিযুক্তা—এমন কি সেই ভ্রাতার গৃহে ভ্রাতৃজায়া কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা ও অবমানিতা হইতেছেন, এমন দৃষ্টান্ত বঙ্গ দেশে অনেক গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই অন্যায়াচরণের প্রতীকার করা যে বিশেষ কর্ত্তব্য, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে বরপণ দ্বারা ইহার প্রতীকার হইতে পারে না। কেন না বরপণ এক পক্ষে যেরূপ উপকার হয়, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। অতএব সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণকে বরপণে বাধ্য না করিয়া, তাঁহারা স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া অবস্থার উপযোগীতা ক্রমে কন্যাকে যৌতুক কিম্বা কন্যাধন স্বরূপ কিছু সম্পত্তি দান করিলে সকল দিকেই মঙ্গল হইতে পারে।

এই শেষোক্ত প্রস্তাবে যাহা উক্ত হইল তাহা অবশ্য ধনবান ব্যক্তিদিগের পক্ষেই প্রযোজ্য। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানবের পক্ষে এ নিয়ম সঙ্গত হইতে পারে না।

এখন কথা এই, বরপণ হইতে এ দরিদ্র দেশের চরম দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিবাহের অন্যান্য ব্যয় আছে। যথা বিবাহ রাত্রির এবং পল্লিগ্রাম-বাসির বিবাহে আত্মীয় কুটুম্বদিগের প্রীতি ভোজন দান, গুরু পুরোহিত প্রণামী ও দক্ষিণা, বাদ্যকর প্রভৃতি বিদায়, ফুলশয্যা প্রভৃতির তত্ত্ব, এ সকল ব্যয় দরিদ্র কন্যাপক্ষের যে কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা অনেকে স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন না। অথচ বিবাহ কালে, এবং বিবাহের পরে এই সকল ব্যয় যথোচিত রূপে সম্পন্ন না হইলে সমাজে কন্যাপক্ষের এবং শ্বশুরালয়ে কন্যার লাঞ্ছনা ও অনাদরের পরিসীমা থাকে না।

এইরূপে "কন্যাদায়ে" দেশের যে রূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা ত সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইহার পরিণাম আরও যে কি ভয়াবহ, কন্যা সন্তানের দরিদ্র জনক জননী যে কি উপায় অব-লম্বন করিয়া জাতি কুল রক্ষা অর্থাৎ সমাজে নিজেদের সম্মান রক্ষা করিবেন, তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাই জানেন। আমরা যুক্ত করে, বিনীত বাক্যে, কন্যার—বিবাহ যোগ্যা কন্যার অর্থহীন অভিভাবক দিগকে বলিতেছি, তাঁহারা সকলে সম-বেত হইয়া মানবোচিত সাহস প্রকাশ করুন। কন্যা বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত এমন কি পথের ভিক্ষুক হইয়া, এ দরিদ্র দেশের